মধ্যযুগের ভারত ও বাংলার ইতিহাস অনুসন্ধান

যদুনাথ সরকার (১৮৭০-১৯৫৮)

বাঙালির ইতিহাসচর্চা, চিন্তা ও ভাবনায়, গবেষণায় এবং সাধনায় বিশ শতকের প্রথমার্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর থেকে বাংলায় ইতিহাস-চেতনার আধুনিক যুগ শুরু হয়। বস্তুত বাঙালির আধুনিক ইতিহাসতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ প্রাচ্য দেশসমূহে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রসারেরই অংশ। আঠারো শতকে ইউরোপে ইতিহাসশাস্ত্র ছিল সাহিত্য এবং অতীত বর্ণনা। উনিশ শতকে ইতিহাসচর্চা বিজ্ঞান হিসেবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে অবস্থান নেয়। বিশ শতকের ইউরোপে ইতিহাস যুগপৎ বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান এবং বৃহত্তর অর্থে ইতিহাস একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা (Form of thought) রূপে আত্মপ্রকাশ করে।[১] পাশ্চাত্যের ইতিহাস-ভাবনার সঙ্গে প্রাচ্যের বিশেষত ভারতীয় ইতিহাস-ভাবনার সংযোগ ঘটে উইলিয়াম জোন্সের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। পাশ্চাত্য পক্ষপাতবর্জিত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচ্যের সভ্যতা অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিনিবদ্ধকারী তিনিই প্রথম পথিকৃৎ। তিনি এটা অনুধাবন করেছিলেন যে, প্রাচ্যকে না জেনে মানবজাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ হতে পারে না।[২] বস্তুত উইলিয়াম জোন্স, প্রিন্সেপ, কোলব্রুক প্রমুখদের পথ ধরে উনিশ শতকে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) প্রভৃতি বাঙালি পণ্ডিতেরা ইতিহাসশাস্ত্র সাধনা ও অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাস-গবেষণা বহুমাত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ অতিক্রম করে বিশ শতকে এসে নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। আধুনিক শিক্ষার প্রসার, ইউরোপীয় ইতিহাসদর্শনের প্রভাব, পাশ্চাত্যের জীবনধারা ও ভাবাদর্শের সংস্পর্শ এবং উচ্চতর বিদ্যায়তনসমূহে ইতিহাস-অধ্যয়নের অগ্রগতি এই নতুন মাত্রা সূচনায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই পটভূমিতে মধ্যযুগের ভারত ও বাংলার ইতিহাস-গবেষণায় নবতর ধারার সৃষ্টি হয়। তৎকালীন সময়ের প্রাপ্ত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে মূল উৎস উপাত্ত আবিষ্কার ও সংগ্রহ ছিল এই ধারার কেন্দ্রীভূত মনোযোগ।[৩] বাঙালির ইতিহাস অনুধ্যানের এই নতুন যুগের অধিনায়কত্ব করেছেন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার। সত্য ও জীবন্ত এবং পূর্ণাঙ্গ

Scanned with CamScanner

ইতিহাস নির্মাণই ছিল তাঁর ধ্যান ও ধারণা।[৪] G. R. Elton বলেছিলেন যে, ভাল ঐতিহাসিক জন্মগ্রহণ করতে পারে কিন্তু সত্যিকার ঐতিহাসিক তৈরি হয়।[৫] যদুনাথ সরকারের ক্ষেত্রে এটা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতে—যদুনাথের ইতিহাস-রচনা একটি যুগাবসান থেকে যুগান্তরের দিকে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে।[৬] স্নাতক পর্যায়ে ইতিহাস তাঁর অধীত বিষয় হলেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের কৃতী ছাত্র। পরবর্তী জীবনে ইংরেজি সাহিত্যের মেধাবী ছাত্র যদুনাথ চলে এসেছিলেন ইতিহাস-গবেষণায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনিশ শতকের খ্যাতনামা জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯১-১৮৮৬) ভাষাতত্ত্ব থেকে চলে এসেছিলেন ইতিহাস-গবেষণায়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় যদুনাথ সরকারের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেন :

> আচার্য যদুনাথের একটি মূর্তি আছে যাঁরা তাঁকে জানতেন তাদের মানস চক্ষে। সে মূর্তিটি নিয়মে-সংযমে শাসিত বজ্রদৃঢ় একটি পুরুষের, ঋজু অনমনীয় যাঁর ব্যক্তিত্ব, স্পষ্ট ও বিরালালঙ্কার যার বাকভঙ্গি, অতি পরিমিত যার ভাষণ, পিউরিট্যান যার চরিত্র, কঠোর রুটিনাবদ্ধ যার জীবন চর্যা, সুখে যিনি বিগতি স্পৃহ এবং দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা।[৭]

ইতিহাস-গবেষণা ও অনুশীলনে যদুনাথ সরকার ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তিনি ছিলেন গোষ্ঠীপতি বহু তরুণ ঐতিহাসিকের পথপ্রদর্শক সত্যসন্ধানী পরম গুরু; অতীত ভারতের বিক্ষিপ্ত ইতিহাস মন্থন করে তার সারবস্তুটি, বহু আয়াস অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।[৮] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাঙালি বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) যেমন এক বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি যদুনাথও অনেক তরুণ ঐতিহাসিক সৃষ্টি করেছিলেন, যারা উত্তরকালে ইতিহাস-গবেষণায় সুনাম অর্জন করেছিল। গবেষণায় মননে, পাণ্ডিত্যে, সাধনায় ও মনীষায় যদুনাথ সরকার এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী ইতিহাসবিদ। প্রায় ছয় দশক তিনি একটানা ইতিহাস-সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র ভারতীয় মুঘল ইতিহাসের শেষপ্রান্ত হলেও তিনি এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। এই প্রসঙ্গে মারাঠী ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই (১৮৬৫-১৯৫৮) লিখেছেন :

> But the Mughul Empire has proved too small to contain all the energy and learning of Jadunath. The dry bed of the history of the Medieval Bengal as well as the tumultuous mountain stream of Maratha history has been equally benefited by the outfelow of Jadunath's genius as a historian.[৯]

অর্থাৎ শুধুমাত্র মুঘলসাম্রাজ্য নিয়ে গবেষণা তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার কাছে খুবই ছোট প্রমাণিত হয়েছে। এইজন্য মধ্যযুগের ভারতের সীমানা অতিক্রম করে ভারতে ব্রিটিশশাসনের ইতিহাস, ভারতের সামরিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ইতিহাস, ভারতীয়

সভ্যতার সামগ্রিক মূল্যায়ন এবং সমকালীন সমাজ ভাবনায় যদুনাথের পদচারণা লক্ষ করা যায়। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, জীবনদর্শন ছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি ও বিশালতায় তিনি একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর আদর্শ, নিষ্ঠা ও ধারাকে বহন করে অনেক যোগ্য শিষ্য পরবর্তী ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন এবং নিজেরা যশস্বী হয়েছেন। যদুনাথ সরকার বাঙালির ইতিহাস-গবেষণার মাত্রা নির্ধারক। শিক্ষাগুরু যদুনাথ সম্পর্কে কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেন :

> ঘরে বাইরে সকলেই যদুনাথকে ঐতিহাসিক বলিয়া সমীহ করে; সুতরাং তিনিই আমাদের মাপকাঠি। তাহার কৃপায় আমি কত বড় ঐতিহাসিক হইয়াছি বুঝিবার জন্য মাপিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দাঁড়াইয়া মেরুদণ্ড সোজা করিলেও মাথা গুরুজীর কোমর পর্যন্ত পৌঁছায় না।[১০]

তাঁর অধিকাংশ রচনা ইংরেজি ভাষায় হলেও বাংলাভাষায়ও তিনি সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। বস্তুতপক্ষে যদুনাথ সরকার ভারত ও বিশ্বের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।[১১] বর্তমান শতাব্দীর এশিয়ার ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন। আমাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম।[১২] উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাঙালির ইতিহাসচর্চার যে প্রাথমিক সূত্রপাত হয়, দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় তা পরিপূর্ণ আধুনিক রূপ গ্রহণ করে। ইউরোপীয় ভাবনা, দর্শন ও পদ্ধতিবিদ্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত যদুনাথ সরকার ইতিহাস-গবেষণায় আধুনিক ধারার সূত্রপাত করেন। উনিশ শতকের হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলন থেকে তিনি ছিলেন বহুলাংশেই মুক্ত। তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-গবেষণাই ছিল যদুনাথ সরকারের মূল লক্ষ্য। সত্যিকার অর্থে বাঙালির আধুনিক ইতিহাস-সাধনার সূত্রপাত করেন তিনি।

জীবনীগত পরিমণ্ডল

১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর রাজশাহী বিভাগের নাটোর জেলার আত্রাই রেল স্টেশন থেকে দশ মাইল পূর্বদিকে করচমাড়িয়া গ্রামে যদুনাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন।[১৩] তাঁর পিতার নাম রাজকুমার সরকার (১৮৩৯-১৯১৪) এবং মা হরিসুন্দরী দেবী (১৮৪৭-১৯৩৪)। এক অভিজাত ও সংস্কৃতিবান কায়স্থ পরিবারের সন্তান তিনি।[১৪] সরকার পরিবারের এক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ নিমাইচাঁদ সরকার। তিনিই ছিলেন সরকার পরিবারের প্রকৃত পত্তনকারী। গ্রাম্য সাধারণ জমিদার বা ছোট ব্যবসাদার থেকে এই অখ্যাত পরিবারকে ধনেজনে সমৃদ্ধ ক্ষমতাসম্পন্ন ধনী জমিদার পরিবারে তিনিই উন্নীত করেন।[১৫] সরকার পরিবারের আদি নিবাস এই করচমাড়িয়া গ্রামে ছিল না। এই গ্রাম থেকে মাইলখানেক দূরে নাগর নদী তীরস্থ ছত্রদিঘীতে ছিল আদি নিবাস। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন ও নাটোর

Scanned with CamScanner

জমিদার পরিবারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে এবং এই পুরো অঞ্চলে এক সামাজিক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সরকার পরিবার করচমাড়িয়া গ্রামে চলে আসেন। সরকার পরিবারের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে একটি প্রামাণ্যচিত্র পাওয়া যায় বিভা সরকারের লেখা একটি প্রবন্ধে।[১৬] যদুনাথের পিতা রাজকুমার রাজশাহীর ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রাজকুমার ছিলেন অন্যতম। তিনি বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে এফএ অধ্যয়ন করেন। পিতার মৃত্যুতে রাজকুমার বহরমপুর ছেড়ে রাজশাহী চলে আসেন। এখানে তিনি অনেক সামাজিক ও জনহিতকর কাজে জড়িত হন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৮৭২ সালে রাজশাহী এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা, রাজশাহী কলেজে স্নাতক পাঠক্রম চালু, 'রাজশাহীবাসী' নামে পত্রিকার সম্পাদনা ইত্যাদি।[১৭] এইভাবে রাজকুমার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), দীঘাপতিয়ার জমিদার প্রমথনাথ রায় প্রমুখ সুধীজনের প্রশংসাভাজন হন।[১৮] তিনি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক রাজশাহী ব্রাহ্ম সমাজের ট্রাস্টি নিযুক্ত হয়েছিলেন।[১৯] এইভাবে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে রাজশাহীর সরকার পরিবার ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়। বস্তুতপক্ষে রাজকুমার সরকার ছিলেন শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগী। নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনায় যদুনাথের বাবা ছিলেন উনিশ শতকের পাশ্চাত্য প্রভাবে সৃষ্ট ভারতীয় নবজাগরণের সন্তান।[২০]

আধুনিক শিক্ষা ও ভাবাদর্শের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে যদুনাথ সরকারের বাল্যজীবন অতিবাহিত হয় এবং মানসলোক গড়ে উঠে। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী বাল্যকালেই তাঁর হাতেখড়ি হয়। তাঁর পিতার স্থাপিত গ্রামের শম্ভুনাথ পণ্ডিতের পাঠশালায় তিনি যে দু'বছর অধ্যয়ন করেছিলেন সেটা তিনি সঠিক স্মরণ করতে পারতেন।[২১] আট বছর বয়সে তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সর্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং মাত্র এক বছর পড়াশোনার পর কলকাতায় চলে আসেন। এখানে যদুনাথ হেয়ার স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এক বছর পর সিটি কলেজিয়েট স্কুলে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন। দুই বছর কলকাতায় অবস্থানের পর পুনরায় রাজশাহী ফিরে আসেন। এখানে যদুনাথ রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে পুরাতন পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর ১৮৮৭ সালে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীর সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে সকল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাস করেন।[২২] ১৮৮৯ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে এফএ পরীক্ষায় কৃতত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি দশম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯১ সালে যদুনাথ কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৯২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজ

রেজিস্ট্রারে যদুনাথ সরকারের ছাত্র-জীবনের কৃতিত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে :

> Jadunahth Sarkar 1889-1892; BA 1891 (1st class 2nd in history and 2nd class 2nd in English); M.A. 1892 (1st class 1st in English with record marks); Gold medalist and Prizeman.[২৩]

শিক্ষাজীবন পরিসমাপ্তির পর যদুনাথের কর্মজীবন শুরু হয়। ১৮৯৩ সালে জুন মাসে কলকাতার রিপন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৯৬ সালের মার্চ থেকে ১৮৯৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন (মেট্রোপলিটন কলেজ)।[২৪]

১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যদুনাথ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৮ সালের জুন মাসে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগে সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। যদুনাথ সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি বিভাগে কর্মরত ছিলেন ১৮৯৮ সালের জুন থেকে ১৮৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত। পরে ১৯০১ সালের জুলাই-ডিসেম্বর পর্যন্ত পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৯৯ সালে জুলাই থেকে ১৯০১ সালের জুন পর্যন্ত তিনি পাটনা কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পুনরায় ১৯০২ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত একটানা পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯১৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত যদুনাথ সরকার কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন।[২৫] ১৯১৮ সালে তিনি আইইএস (ইন্ডিয়ান এডুকেশনাল সার্ভিস)-এ উন্নীত হন।[২৬] উড়িষ্যার কটক র‍্যাভেনশ কলেজে ইতিহাস ও ইংরেজি অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ১৯১৯ সালের জুলাই থেকে ১৯২৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পুনরায় পাটনায় চলে আসেন। এখান থেকে ১৯২৬ সালের শুরুতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালের ৪ অক্টোবর যদুনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক উপাচার্য।[২৭]

যদুনাথ সরকার সুদীর্ঘ জীবন পরিসরে অনেক সম্মান লাভ করেছেন। ১৯০৯ সালে তিনি গ্রিফিথ প্রাইজ পান। ১৯২৩ সালে ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানীত সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় পর্যন্ত সোসাইটি বিশ্বের ত্রিশ জন ব্যক্তিত্বকে এই সম্মানে ভূষিত করেছিল। যদুনাথ ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭ সালে আমেরিকার ইতিহাস সমিতি তাঁকে আজীবন সদস্য নির্বাচিত করে। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৪৪ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যদুনাথকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রি প্রদান করেন। তিনি ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।[২৮] তিনি ১৩৪২-৪৩, ১৩৪৭-৫১, ১৩৫৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য

SUCHETA MAHAJAN

Scanned with CamScanner

পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন এবং ১৩২৫-২৮, ১৩৩৪, ১৩৪১, ১৩৪৪-৪৬, ১৩৫২-৫৩ ও ১৩৫৫-৫৬ সালে পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন।[২৯] ১৯৫২ সালে যদুনাথ ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের সভাপতি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রস্তাবিত ডি-লিট প্রদানের বিষয়টি যদুনাথ প্রত্যাখ্যান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের এক সভায় তাঁকে ডি-লিট ডিগ্রি প্রদানের বিষয়টি আলোচনার সময় একজন সদস্য আপত্তি করেন। আপত্তিকারী সদস্য হলেন তৎকালীন ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অতীন্দ্রনাথ বসু। তিনি যদুনাথ সরকারের প্রতিভা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। সিনেট থেকে প্রস্তাব পাস হলেও যদুনাথ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। যথাসময়ে সিনেটে পাস করা প্রস্তাবের কপি তাঁর নিকট প্রেরিত হয়। কিন্তু প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে না হওয়ায় যদুনাথ সরকার এই সম্মানসূচক ডিগ্রি গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে চ্যান্সেলারকে পত্র দেন।[৩০] ভারত স্বাধীন হওয়ার পর সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব 'ভারত রত্ন' প্রবর্তিত হয়। এই সময় যদুনাথ সরকারকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) যদুনাথকে 'ভারত রত্ন' উপাধি দেয়ার জন্য জোরালো যুক্তি উত্থাপন করেন। কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) এতে রাজি হননি। 'পদ্মভূষণ' উপাধির প্রস্তাব যদুনাথ সরকার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৩১] ১৯৫৮ সালের ১৯ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু ও সংক্ষিপ্তসার

যদুনাথ সরকারের কর্মকাণ্ডের ব্যাপ্তি বিশাল। আজীবন ইতিহাস-সাধনায় নিবেদিত তাঁর কর্মকাণ্ডকে ঐতিহাসিক জগদীশ নারায়ণ সরকার তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন।[৩২] এগুলো হলো—Mughul Studies, Maratha Studies এবং Chips from his main workshop. যদুনাথের সমগ্র কর্মপ্রবাহের বিষয়বিন্যাস এরূপ—ভূ-বিবরণ ও পরিসংখ্যান, জীবনীগ্রন্থ, ইতিহাসগ্রন্থ, সরকার পদ্ধতি, অর্থনীতি, প্রবন্ধমালা ও ব্যাপক নিরীক্ষণমূলক জরিপকর্ম, কর্মসংক্রান্ত এবং সামরিক ইতিহাস।[৩৩] দু'জন ইতিহাস-গবেষক তাঁর রচনাবলীকে তিনটি ভাগে বিন্যাস করেছেন।[৩৪] এগুলো হলো—মুঘল ইতিহাস, মারাঠা ইতিহাস এবং অন্যান্য। বস্তুত যদুনাথের কর্মকাণ্ডের এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় তাঁর মূল দুটি গবেষণা ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গবেষণা-জীবনের দীর্ঘসময় তিনি এই দুটো ক্ষেত্রে অতিবাহিত করেছেন। তবে এই বিষয়ের বাইরেও তাঁর মৌলিক গবেষণাকর্ম রয়েছে। যুদনাথ সরকারের সমগ্র গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের আলোকে তাঁর কর্মকাণ্ডকে প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথমত মুঘল ইতিহাস,

দ্বিতীয়ত মারাঠা ইতিহাস, তৃতীয়ত বাংলার ইতিহাস, চতুর্থত ধর্মীয় ইতিহাস, পঞ্চমত বিবিধ বিশেষত ভারতে ব্রিটিশশাসন, ভারতের অতীত বর্তমান, জয়পুরের ইতিহাস, সমকালীন সমস্যাবলী ইত্যাদি। গবেষণাকর্মের প্রকৃতি ও ধরনের দিক থেকে তাঁর ইতিহাস-সাধনাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত মৌলিক গবেষণাকর্ম, দ্বিতীয়ত সম্পাদিত কর্ম এবং তৃতীয়ত অনুবাদকর্ম। কালের পরিসীমায় এই ইতিহাসবিদের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষ প্রান্তের দিকে। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের শাসনামলের মাঝামাঝি থেকে ১৮০৩ সালে মুঘল সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছিল যদুনাথের প্রধান বিচরণভূমি।

ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র যদুনাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সমাপনান্তে ইতিহাস-গবেষণার দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি প্রথমেই আধুনিক ভারত তথা ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধের উপর গবেষণা করার মনস্থ করেছিলেন।[৩৫] এইজন্য তিনি এ বিষয়ের উপর শতাধিক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। পরে তিনি বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে অনুধাবন করেন যে, নিকট অতীতে ঘটে যাওয়া ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ সম্পর্কে সত্যিকার মূল্যায়ন অসম্ভব। এখান থেকে যদুনাথ মুঘল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন প্রামাণ্য গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। তাঁর মুঘল ইতিহাস-গবেষণার সূত্রপাত 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি প্রাপ্তির মাধ্যমে। এই বৃত্তির গবেষণা অভিসন্দর্ভ *India of Aurangazib : Topography, Statistics and Roads* প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। *খুলাসাত-উত-তাওয়ারিখ* ও *চাহার-ই-গুলশান* এই দু'টি পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে এই গ্রন্থ রচিত।[৩৬] গ্রন্থটি নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত :

ক. প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টি গুরুত্ব, পরিধি এবং উপাদান সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মুঘলসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি তথা সুবা, সরকার, মহল, সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি, পরিমাপকৃত এলাকা ইত্যাদি।

গ. গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে মুঘলসাম্রাজ্যের রাজস্বব্যবস্থা।

ঘ. চুতর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হলো দিল্লীসহ মুঘলসাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহের বর্ণনা।

ঙ. পঞ্চম অধ্যায়ে মুঘলসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহের বিবরণ স্থান পেয়েছে।

বস্তুত এই গ্রন্থটি ইতিহাস বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। এটা হলো সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থার এক বিবরণ। গ্রন্থটি প্রসঙ্গে K R Qanungo বলেন :

> Jadunath's India of Aurangzib : its topography statistics and roads, published in 1901, was a surprise to his contemporaries and at once hailed as a model of neat and exact scholarship.[৩৭]

Scanned with CamScanner

অর্থাৎ এই গ্রন্থ যদুনাথের সমকালীনদের নিকট ছিল আশ্চর্য ঘটনা এবং একই সঙ্গে গবেষণার একটি মূল ও বাস্তব মডেল। গ্রন্থটিকে মুঘল আমলের গেজেটিয়ার কিংবা পরিসংখ্যানমূলক তথ্যবিবরণী বলা যেতে পারে। যদুনাথ সরকারের মুঘল ইতিহাসের উপর পরবর্তী বিশাল কর্মযজ্ঞের এটা ছিল প্রস্তুতিপর্ব। এই গ্রন্থটি যদুনাথকে বিদ্বজ্জন মহলে পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশের পরবর্তী দশ বছর যদুনাথ একান্ত ও নিঃশব্দ গবেষণায় নিমগ্ন থাকেন। এই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর মূল্যবান গবেষণাকর্ম *History of Aurangzib*-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। মোট পাঁচ খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই গবেষণাকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২৪ সালে।[৩৮] পাঁচটি খণ্ডের বিষয়বিন্যাস নিম্নরূপ :

Vol. I	Account of the reign of Shahjahan and early career of Aurangzib.
Vol. II	War of Succession.
Vol. III	Northern India, early measures of his reign (1658-1681).
Vol. IV	Southern India-Deccan affairs including the death of Sambhji and relation with Bijapur and Golcunda.
Vol. V	The last eighteen years, War with Marathas evaluation and achievements of Aurangzib.

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশাল ও ঘটনাবহুল। প্রথম খণ্ডের বিষয় হলো মুঘল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। এই খণ্ডের মোট অধ্যায় সংখ্যা চৌদ্দটি। দ্বিতীয় খণ্ডের তেরোটি অধ্যায়ে রয়েছে মুঘল সিংহাসন নিয়ে সম্রাট শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-দ্বন্দ্ব। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৬১৮ থেকে ১৬৫৮ সালের গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের জীবনের প্রথম ৩৯ বছরের ইতিহাস স্থান পেয়েছে। গৃহযুদ্ধে জয়লাভের মধ্যে দিয়ে তিনি মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রন্থের এ দু'টি খণ্ডের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে R. C. Temple বলেন :

> These two volumes comprise in reality the reign of Shahjahan and Aurangzib, but their main value lies in the fact that they bring before the student the first connected authentic account of these two reigns.[৩৯]

অর্থাৎ এ দু'খণ্ডে শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনকাল বর্ণিত হয়েছে, দুইজনের শাসনকাল সম্পর্কে মূল আকরগ্রন্থ হিসেবে এটার মূল নিহিত আছে। *History of Aurangzib* গ্রন্থটির তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ সাল পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের শাসনকাল।[৪০] এই ইতিহাস প্রধানত উত্তর ভারতের ইতিহাস। এখানে রয়েছে মোট তেরোটি অধ্যায়। রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পাশাপাশি আওরঙ্গজেবের প্রবর্তিত ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানসমূহ, অমুসলিম

সমাজের উপর জিজিরা কর আরোপ, হিন্দুমন্দির ধ্বংস, প্রবর্তিত কঠোর শাসনব্যবস্থা এবং হিন্দুসমাজের প্রতিক্রিয়া এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের সময় ভারতবর্ষে ও বাংলায় হিন্দু-মুসলিম রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ধারায় বহমান। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিক ধারার বিপরীতে মুসলিম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা ক্রমাগতভাবে বেড়ে চলেছে। এই পটভূমিতে বিশেষভাবে আওরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও অমুসলিম নীতি প্রসঙ্গে গ্রন্থ রচনা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। জি ইয়াজদানীর মতে এই খণ্ডে ইতিহাসের মূল পরিপ্রেক্ষিত রক্ষিত হয়নি এবং বিচারের ভারসাম্য উপেক্ষিত হয়েছে। এই তৃতীয় খণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গে জি. ইয়াজদানীর অভিমত হলো :

> There is a lack of balanced judgement and correct historical perspective in the work. So far as the narration of undisputed facts in concerned Professor Sarkar may be followed implicitly : but in his discussions of subtle questions of state policy and religious dogma it is clear that he does not weigh the various aspects of the problems, and so the picture of events, as we get in the book is distorted. For instance when speaking of Aurangzibs bigotry, Professor Sarkar freely condemns the policy of the previous Sarkars also.[৪১]

এই বিশাল গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে রয়েছে ১৬৪৫-১৬৮৯ সাল পর্যন্ত মোট পঁয়তাল্লিশ বছরের ইতিহাস।[৪২] এই খণ্ডে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস তথা শিবাজী, শম্ভুজীর রাজত্বকালের ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে রয়েছে ১৬৮৯ থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ আঠারো বছরের ইতিহাস। এইভাবে ১৯০১ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সালে আওরঙ্গজেব গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ চব্বিশ বছর যদুনাথ আওরঙ্গজেবের ইতিহাস উদ্ধারে নিমগ্ন থাকেন। ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে এই গ্রন্থের সময়কাল একটি উত্তরণশীল অধ্যায়। এই সময়কালের গুরুত্ব সম্পর্কে যদুনাথ সরকার *History of Aurangzib* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় বলেন :

> The history of Aurangzib is practically the history of India 60 years, 1658-1707 covers half of the 17th century. Mughul empire became largest unit, one political unit, decline and disruption, uprising Maratha nationality, Madras and Bombay became presidencies of East India company 1653-1687, Calcutta founded 1690.[৪৩]

অর্থাৎ এই সময় মুঘলসাম্রাজ্য বিস্তৃতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে, ভারতবর্ষ একক রাজশক্তির ছত্রছায়ায় আসে, আবার এই সময়ে মুঘলসাম্রাজ্য পতনের দিকে ধাবিত হয়। মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে, বহিরাগত ইংরেজ ইস্ট

SUCHETA MAHAJAN

Scanned with CamScanner

ইন্ডিয়া কোম্পানি মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলকাতায় শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে।[৪৪] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কালসীমায় ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষপটে ব্যক্তি আওরঙ্গজেব সম্পর্কে যদুনাথ সরকার বলেন যে, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী, পরিশ্রম ও মনোযোগের দিক থেকে যেকোনো করণিকের চেয়ে শক্তিমান, জীবনচর্চায় আওরঙ্গজেব সরল এবং দরবেশের মত। যুদ্ধক্ষেত্রে ও কূটনীতিতে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের দাবিদার। তবু অর্ধ-শতাব্দীর শাসনামল ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ।[৪৫] এই ব্যর্থতার কারণ প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন :

> The cause of this political paradox is to be found in Auragzib's policy and conduct.[৪৬]

অর্থাৎ এই রাজনৈতিক আপাত স্ববিরোধীর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আওরঙ্গজেবের নীতি ও আচরণের মধ্যে। পাঁচ খণ্ডে সুদীর্ঘ সময়ে সমাপ্ত এই গ্রন্থকে একজন গবেষক An epic in Indian historiography বলে অভিহিত করেছেন।[৪৭] প্রামাণ্য তথ্যের ভিত্তিতে যদুনাথ দেখিয়েছেন যে একটানা যুদ্ধবিগ্রহ ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে মুঘল উৎপাদন-ব্যবস্থার উৎসগুলি ভেঙ্গে পড়ে, মুঘল অভিজাত শ্রেণী দুর্বল হয়ে যায়। উপরন্তু ধর্মীয় সংঘাত বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যায়। পরিণতিতে মুঘলসাম্রাজ্যের পতন নেমে আসে। আওরঙ্গজেবের ইতিহাস পর্যালোচনায় যদুনাথ বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেচেন। মমতাজুর রহমান তরফদার বলেন যে, ইতিহাস আলোচনায় বিষয়বস্তুর প্রতি যে সহানুভূতির প্রয়োজন এবং ঐতিহাসিকের তরফ থেকে যে মানসিক প্রসারতার দরকার তা তাঁর লেখায় পর্যাপ্তভাবেই পরিলক্ষিত হয়।[৪৮]

গবেষণাকর্মের পরিধি ও গুরুত্বের দিক থেকে মুঘল ইতিহাসের উপর যদুনাথ সরকারের একটি প্রধান কীর্তি হলো চার খণ্ডে রচিত *Fall of the Mughul Empire*.[৪৯] ইংরেজি ঐতিহাসিক উইলিয়াম আর্ভিন *Later Mughuls* গ্রন্থটিতে মুঘলসাম্রাজ্যের ইতিহাস যে পর্যন্ত রচনা করেন, সে সময় থেকে মুঘলসাম্রাজ্যের পরবর্তীকালে ইতিহাস ছিল যদুনাথ সরকারের গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়। নাদির শাহের ভারতত্যাগের পর থেকে ব্রিটিশশক্তির দিল্লির দখল (১৭৩৯-১৮০৩) পর্যন্ত যদুনাথের গ্রন্থের বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস নিম্নরূপ :[৪৯ক]

Vol. I Reign of Muhammad Shah

Vol. II Devoted to the classic contest between Afghan and Marathas, which culminated the battle of Panipath 1761, the rise and decline of the Jat Kingdom, disintregation of political power in Rajputana, Malwa and Panjab.

Vol. III Struggle for control over puppet emperor by rival muslim nobles end December, 1774.

Vol. IV Story Mahadji Sindhia's won over Rajputs, ends with British paramountcy in 1803.

মুঘলসাম্রাজ্য নিয়ে যদুনাথ যে গবেষণা শুরু করেছিলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্তি এবং India of Aurangzib (১৯০১) গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে, তারই চূড়ান্ত পরিণতি হলো *Fall of the Mughul Empire* গ্রন্থ। এই বিশাল গবেষণাকর্ম পরিসমাপ্তির পর বন্ধু গোবিন্দ সখারাম সরদেশাইকে এই পত্রে যদুনাথ লিখেন :

> I can say that I have written it, not with ink, but with my heart blood.[৫০]

অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে, কলমের কালি দিয়ে এই গ্রন্থ লিখিনি, লিখেছি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। যদুনাথের আওরঙ্গজেব গ্রন্থের চেয়ে মুঘলসাম্রাজ্য পতনের ইতিহাস গ্রন্থটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থটি ইউরোপে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। তিনি এই গ্রন্থকে শুধু মুঘলসাম্রাজ্যের ইতিহাস হিসেবে অভিহিত করেননি। মারাঠাশক্তির পতন হিসেবেও মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন 'Its subject is even more truly the fall of the Maratha empire.'[৫১] ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, এই গ্রন্থ একদিকে মুঘল মারাঠা শক্তির পতনের ইতিহাস, অন্যদিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রাজশক্তির উত্থানের ইতিহাস। এই গ্রন্থের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে K. R. Qanungo বলেন :

> Jadunath gains more in ease, humour and eloquence, shows a greater mastery over historical narrative, and a higher literary workmanship, keeping wonderful balance between synthesis and analysis by handling the telescope and microscope of history in his Fall of the Mughul Empire.[৫২]

যদুনাথ এই গ্রন্থে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য বিধান করে ঐতিহাসিক বর্ণনা এবং উচ্চতর সাহিত্যকর্মের পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের পটভূমি নিঃসন্দেহে এক ব্যাপক ও বিস্তৃত ইতিহাস। বস্তুত ভারতীয় ইতিহাসের এই অধ্যায়টি মুঘল, মারাঠা, জাঠ, রোহিলা, আফগান, শিখ এবং বহিরাগত ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থ-সংঘাতের ইতিহাস। গ্রন্থটি সম্পর্কে G. S. Sardesai-এর অভিমত হলো :

> These four volumes bring together in a clear outline the bewildering more of India's eighteenth century history with remarkable success in unravelling the various threads. The advent of British power on the Indian scene and its rapid expansion have been well clarified in Jadunath's writings.[৫৩]

এই গ্রন্থটি দুর্বল মুঘল সম্রাটের দরবারে ষড়যন্ত্র, প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং চক্রান্তের এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এখানে যদুনাথ ভারতীয়

Scanned with CamScanner

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মুঘল, মারাঠা, রাজপুত ও জাঠদের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করেছেন।

উপরিউক্ত দু'টি গ্রন্থ ছাড়াও মুঘল ইতিহাস নিয়ে যদুনাথ সরকারের আরও কিছু গবেষণাকর্ম রয়েছে। *Studies in Mughul India* নামের গ্রন্থটি বিষয়বৈচিত্র্যে ও প্রামাণ্য—তার দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক।[৫৪] গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে S. M. Edwards বলেন :

> The author has provides a pleasant adjunct to the purely political history of the Mughul empire.[৫৫]

যদুনাথের আরও একটি গ্রন্থ *Studies in Aurangzibs reign* প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। এই গ্রন্থটি *Studies in Mughul India* গ্রন্থটির পরিপূরক। এতে আওরঙ্গজেবের আমলের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত আঠারোটি প্রবন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে পনেরোটি প্রবন্ধ *Studies in Mughul India* গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে এবং তিনটি নতুন প্রবন্ধ যুক্ত হয়েছে।[৫৬] এই গ্রন্থে আওরঙ্গজেবের আমলের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ইংরেজ ঐতিহাসিক উইলিয়াম আর্ভিনের একটি অসমাপ্ত প্রকল্প যদুনাথ সমাপ্ত করেন। দুই খণ্ডের এই গ্রন্থটি অসমাপ্ত রেখে উইলিয়াম আর্ভিনের মৃত্যু হয়। উইলিয়াম আর্ভিন প্রধানত ফারসি উপাদানের ভিত্তিতে Later Mughuls গ্রন্থটি রচনা করেন। কিন্তু এই অধ্যায়ের ইতিহাস লেখার জন্য ভারতীয় ভাষার উপাদান ও ইউরোপীয় উপাদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। উপরন্তু আর্ভিনের মূল রচনায় পাদটীকার বাহুল্য ছিল অনেক বেশি। যদুনাথ আর্ভিনের গ্রন্থ সম্পাদনা করতে গিয়ে প্রাপ্ত নতুন উপাদানের আলোকে অনেক বিষয় পুনর্বিন্যাস করে গ্রন্থটির সম্পূর্ণতা দান করেন। আর্ভিনের গ্রন্থের সম্পাদনাকার্যে নিযুক্ত থাকার সময় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রিডারশীপ বক্তৃতা দেয়ার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হন। যদুনাথ বক্তৃতার বিষয় নির্ধারণ করেন নাদির শাহের ভারত অভিযান। এই তিনটি বক্তৃতা আর্ভিনের গ্রন্থের শেষে যুক্ত করে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করেন। তাঁর রচিত তিনটি অধ্যায় হলো—

> Chapter XI—Internal Condition of India in 1738 : Rise and progress of Nadir Shah, Chapter XII—Nadir Shah' s Invasion of India; chapter XII—Nadir Shah in Delhi : His Return.[৫৭]

যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত ও সম্পন্নকৃত *Later Mughuls* গ্রন্থটির সমালোচনা করতে গিয়ে S M Edwards বলেন :

> To secure this happy consummation of his friend long laboures in the field of Mughul history has been the pious task of professor Sarkar—a striking instance, it seems to us of the comaraderie which unites the true scholars of the East and West.[৫৮]

Sir Wolseley Haig পরিকল্পিত এবং স্যার রিচার্ড বার্ন সম্পাদিত The Cambridge history of India-এর চতুর্থ খণ্ডে যদুনাথ সরকার চারটি অধ্যায় লিখেছেন। দু'টি অধ্যায়ে রয়েছে আওরঙ্গজেব, একটিতে বাহাদুর শাহ, জাহান্দর শাহ, ফররুখ শিয়ার প্রমুখ এবং অন্য একটি অধ্যায়ের বিষয় হলো হায়দরাবাদ রাজ্য। ভারতে মুঘলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে যদুনাথের লেখা একটি গ্রন্থ হলো *Mughul Administration*.[৫৯] মোট ১৪টি অধ্যায়ের এই গ্রন্থটিতে মুঘল সরকারের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য, মুঘল সম্রাট ও বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানগণের ক্ষমতার বিন্যাস, রাষ্ট্রীয় কোষাগার, প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় শিল্পসমূহ, আওরঙ্গজেবের রাজস্ব ব্যবস্থা, সরকারি চিঠিপত্র ও সিলমোহর, মুঘলশাসনের সফলতা-ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে রয়েছে মুঘল প্রশাসনিক ইতিহাসের উৎস ও উপাদানের তালিকা। এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বস্তুতপক্ষে এই বিষয়ের উপর এটা একটা প্রামাণ্য গ্রন্থ। গ্রন্থটি সম্পর্কে কে আর কানুনগো বলেন :

> His Mughul Administron is a model of condensation without the sacrifice of clarity. It remains the standard book on the subject, indispensable for every student of Indo-Muslim history.[৬০]

মুঘল প্রশাসনব্যবস্থা সম্পর্কে এই গ্রন্থটি পরবর্তী দীর্ঘ সময় একক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। A Short history of Aurangzib (1618-1707) প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে। সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য যদুনাথ History of Aurangzib গ্রন্থটির পাঁচ খণ্ডকে সংক্ষেপিত করে এক খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর Anecdotes of Aurangzib and historical Essays গ্রন্থটি। এটা মূলত একটি অনুবাদগ্রন্থ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রিয় কর্মচারি হামিদ-উদ-দীন খান নিমচা প্রণীত 'আহকাম-ই-আলমগিরী' নামক পাণ্ডুলিপি থেকে আওরঙ্গজেব সম্পর্কিত বাহাত্তরটি কাহিনী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচিত এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও মুঘল ইতিহাস সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের লেখা অনেক প্রবন্ধ 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' Modern Review, Bengal past and present, Journal of the Bihar and Orissa Society Journal of Bihar Research Society, Journal of the Asiatic society প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মুঘল-ইতিহাস ছাড়াও মারাঠা জাতির ইতিহাস নিয়ে যদুনাথ সরকার গবেষণা করেছেন। মারাঠা জাতির ইতিহাস-গবেষণায় আধুনিকতার সূত্রপাত করেন মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন। গ্রান্ট ডাফ লিখিত *A History of the Marathas* গ্রন্থ লেখার নেপথ্যে প্রেরণা দিয়েছিলেন এলফিনস্টোন। মুঘল ইতিহাস বিশেষত মুঘলশাসনের শেষ অধ্যায়ের ওপর গবেষণা করতে দিয়ে যদুনাথ মারাঠা ইতিহাস-

Scanned with CamScanner

গবেষণা শুরু করেন। তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে মুঘল ইতিহাসের পর মারাঠা-ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। মারাঠা-ইতিহাস নিয়ে যদুনাথের প্রথম গবেষণাগ্রন্থ *Shivaji and His Times* প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে।[৬১] এই গ্রন্থের মোট ১৬টি অধ্যায়ে শিবাজীর জন্মকাল (১৬২৭) থেকে মৃত্যু (১৬৮০) পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। মহারাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, মারাঠা জনগণের জীবনধারা, শিবাজীর বাল্যজীবন, মুঘল রাজশক্তির সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে সংগ্রাম, রাজ্যস্থাপন ও সিংহাসনে আরোহণ, দক্ষিণের রাজ্যগুলির সাথে সম্পর্ক, নৌ-বাহিনী, ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক, সরকারব্যবস্থা, শিবাজীর বিভিন্ন নীতিমালা, ধর্মনীতি এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে যদুনাথ শিবাজীকে মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থটির উপর আলোচনা প্রসঙ্গে R C Temple বলেন :

> I may at once therefore say that great merit of this book by a hindu lies in the fact that he has tried to be fair, tried to get at the original documents and to relate nothing that can not in his judgement be supported by the most reliable authorities open to him.[৬২]

এই গ্রন্থে যদুনাথ শিবাজীর সাফল্য, চারিত্রিক গুণাবলি এবং মারাঠাশক্তির উত্থান পর্যালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে কোন শিবাজী একটি স্থায়ী রাষ্ট্র গঠন করতে ব্যর্থ হন, কেন মারাঠাশক্তির অভ্যুত্থান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো—তা যদুনাথ গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন।

শিবাজীর ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে যদুনাথ লিখেছেন :

> We have unmistakable traces of it as early as the reign of Shavaji—caste grows by fission. It is antagonistic to national union. In proportion as Shivaji's ideal of a hindu swaraj was based on orthodoxy, it contained within itself the seed of its own death.[৬৩]

মারাঠা-ইতিহাস সম্পর্কে যদুনাথের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিক গ্রান্ট ডাফের খ্যাতিকে অনেকটা ম্লান করে দেয়। ভারত-ইতিহাসে সুদূরপ্রসারীভাবে মারাঠারা একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হলেও ভারত-ইতিহাসের মধ্যযুগের শেষে মারাঠা জাতির উত্থান ও শক্তি বিস্তারকে একটি অতুলনীয় ঘটনা বলে যদুনাথ মনে করেন।[৬৪] শিবাজীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মারাঠা জাতির ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। শিবাজী-পরবর্তী মারাঠা-ইতিহাস নিয়ে যদুনাথ সরকার গবেষণা অব্যাহত রাখেন। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয় যদুনাথের গ্রন্থ House of Shivaji : Studies and documents on Maratha history : Royal period)। গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদুনাথ বলেন যে, এই গ্রন্থ ১৬২৬ সাল থেকে ১৭০০ সাল পর্যন্ত রাজকীয় পেশোয়া

আমলের ইতিহাস এবং *Shivaji and His times* গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সংযোজন।[৬৫] এই গ্রন্থে মোট চব্বিশটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে উত্তর-দক্ষিণ ভারতে মুসলিমসংস্কৃতির বিকাশ। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রয়েছে মালিক আম্বর, শাহজীর বাল্যজীবন, শাহজী ভোঁসলার শেষজীবন, শাহজীর ভোঁসলা সম্পর্কে বিজাপুরের রাষ্ট্রীয় দলিলপত্রের সাক্ষ্য, বিজাপুরের বিশিষ্ট অভিজাতবর্গ, শিবাজীর সাথে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক চিঠিপত্র, শিবাজীর উত্তরাধিকার, শম্ভুজীর শাসনামল, মহারাষ্ট্রের ইতিহাসের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়। এই গ্রন্থের বিষয়বিন্যাস ধারাবাহিক নয়। বস্তুত *Shivaji and His Times* গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকে মারাঠা-ইতিহাস সম্পর্কিত যে-সকল প্রবন্ধ যদুনাথ লিখেছিলেন, এই গ্রন্থ তারই সমষ্টি। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ভারতে মুসলিমসভ্যতা ও সংস্কৃতি দু'টি স্বতন্ত্র কেন্দ্রে বিকশিত হয়—দিল্লী ও দাক্ষিণাত্য। এই বিকাশ হয়েছিল সম্পূর্ণ আলাদা ধারায়। এই পার্থক্য সূচিত হয়েছিল দুই অঞ্চলের ইতিহাস ও ভৌগোলিক ভিন্নতা, ভাষা, জাতি এবং ধর্মের ভিন্নতার জন্য।[৬৬] যদুনাথের এই গ্রন্থের একটি বিশেষ দিক হলো মারাঠা ইতিহাস-গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ চারজন ঐতিহাসিকের উপর আলোকপাত।[৬৭] মহারাষ্ট্রের ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুশীলনে এই চারজন ইতিহাসবিদের গবেষণাকর্মের সাথে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

উপরিউক্ত দু'টি গ্রন্থ ছাড়াও মারাঠা ইতিহাস নিয়ে যদুনাথের আরও কিছু গবেষণাকর্ম রয়েছে। একটি গ্রন্থ *Bihar and Orissa During the fall of the Mughul Empire* (with a detaild study of the Marathas in Bengal and Orissa).[৬৮] মোট ছয়টি অধ্যায়ের এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদুনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> I propose to study in these lectures the history of the North-Eastern provinces of the Mughul empire namely Bihar Bengal and Orissa during the fall of that empire in the middle of the 18th century.[৬৯]

মুঘলসাম্রাজ্য পতনের যুগে, মারাঠাশক্তির উত্থানের সময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সামগ্রিক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থ। বাংলাভাষায় মারাঠা-ইতিহাস নিয়ে লেখা যদুনাথের দু'টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এগুলো সাধারণ পাঠকদের জন্য লেখা হয়েছিল। *শিবাজী* গ্রন্থটি (প্রকাশকাল নেই) মারাঠা-নায়ক শিবাজীর জীবনী। *মারাঠা জাতীয় বিকাশ* গ্রন্থে[৭০] শিবাজীর উত্থান এবং শিবাজী পরবর্তীকালের মারাঠা ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। *শিবাজী* সম্পর্কে একটি খুদে পুস্তিকা হলো —*Shivaji : A study in leadership.*[৭১] এই পুস্তিকায় প্রধানত মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী যে সফল নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন, সেই নেতৃত্বের বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর দেশ পরিচালনায়

Scanned with CamScanner

শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে যদুনাথ এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এছাড়াও সমকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মারাঠা ইতিহাস নিয়ে যদুনাথের অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

যদুনাথের মূল গবেষণা মুঘল ও মারাঠা-ইতিহাসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইতিহাস-গবেষণা ও অধ্যয়ন তিনি সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। ধর্মীয় ইতিহাস নিয়ে লেখা যদুনাথের দু'টি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। *Chaitanya's Life and Teaching* গ্রন্থটিতে শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবধর্ম সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।[৭২] ষোড়শ শতকে বাংলা তথা ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ভক্তিবাদ আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ শ্রীচৈতন্য। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত সমন্বয়ধর্মী ও মানবতাবাদী ধারার ধর্মান্দোলন বাংলায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা 'চৈতন্যচরিতামৃত' পুঁথি অবলম্বনে যদুনাথ এই গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি রচনায় তিনি বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্য ভাগবত' এবং জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুঁথি থেকেও প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। এই গ্রন্থে মোট ২৭টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং পুঁথিটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। চৈতন্যচরিতামৃত প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকারের মূল্যায়ন হলো :

> In spite of its epic length, prolixity and repetitions the Chaitanya Charitamrita is a masterpiece of early Bengali literature and has the further merit of making the subtle doctrines of the Vaishnav faith intelligible to ordinary people.[৭৩]

ধর্মীয় ইতিহাসের উপর যদুনাথের লেখা দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো *A History of the Dasnami Naga Sanyasis*.[৭৪] দুই খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদুনাথের মন্তব্য :

> This book will give a general picture of the main course of history of the Dasnami sect and their past service and present position in the life of the Indian nation.[৭৫]

এই গ্রন্থে যদুনাথ মূলত শঙ্করাচার্যের দর্শন, শিক্ষা এবং ভারতীয় হিন্দুসমাজের উপর এই দর্শনের প্রভাব, দশনামী নাগা সন্ন্যাসীদের জীবনধারা, ইতিহাস, তাদের কার্যকলাপ প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। ভারতের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধবাদ ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে আসার পটভূমিতে শঙ্করাচার্যের শিক্ষা ও মতবাদ ভারতীয় হিন্দু-মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। এই দু'টি গ্রন্থের মধ্য দিয়ে যদুনাথ ভারতীয় ধর্মীয় ইতিহাসের এক বিশাল অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন।

বাংলার ইতিহাস ও ইতিহাসতত্ত্বের ধারায় *History of Bengal*, Vol. II (Muslim Period) একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। যদুনাথ সরকার এই গ্রন্থের সম্পাদক। তিনি এই গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ের রচয়িতা।[৭৬] গ্রন্থটি রচনা ও সম্পাদনার কাজে যদুনাথ বিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন। গ্রন্থের জন্য নির্বাচিত লেখকগোষ্ঠী বিভিন্ন অধ্যায় রচনার দায়িত্বে থাকলেও প্রধান সম্পাদককে গ্রন্থের বেশিরভাগ লিখতে হয়েছিল।[৭৭] মুসলমানদের বাংলাবিজয় থেকে শুরু করে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত দীর্ঘকালপরিসীমায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন লেখকদের রচনায় এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন :

> I have had to write more than 200 pages in this volume of a little over 500 pages, besides revising and sometimes recasting the work of many of the other contributors.[৭৮]

যদুনাথের লেখা অধ্যায় ও অধ্যায়ের অংশবিশেষসমূহ হলো—মুসলমানদের বাংলাবিজয়, বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের উত্থান, অন্তবর্তীকালীন হিন্দুশাসন, বাংলায় শেষ আফগান সুলতানগণ (১৫৫৩-১৫৭৫), মুঘলদের প্রথম বাংলাবিজয়, বাংলার প্রশাসক মানসিংহ, মুঘল আমলে বাংলার পরিবর্তন, সম্রাট শাহজাহানের অধীনে বাংলা, বাংলায় মীর জুমলা (১৬৫৯-১৬৬৩), শায়েস্তা খান ও ইব্রাহীম খানের অধীনে বাংলা, বাংলায় মুর্শিদকুলী খানের শাসনামল, বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা এবং বাংলায় মুসলিম-শাসনের অবসান। এটা বলাই বাহুল্য যে, যদুনাথের অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রম এই গ্রন্থ রচনার মূলে একটি সূচকবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে। এই প্রসঙ্গে প্রবোধচন্দ্র সেন বলেন যে, বস্তুত এই গ্রন্থের অধিকাংশই যদুনাথের রচনা এবং তাঁর উপকরণের দ্বারা সমৃদ্ধ। এক্ষেত্রে তিনি একাই একটি সংঘের কাজ করেছেন বললে কিছুমাত্র অসংগত হয় না।[৭৯] এই গ্রন্থটির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেন :

> In the uncharted wilderness of medieval Bengal Jadunath acted as a safe guide and path finder by virtue of his unrivalled mastery of Persian manuscript sources and European records.[৮০]

বাংলায় মুঘলশাসনামলকে যদুনাথ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর মতে এই সময়ে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যদুনাথের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। তাঁর ভাষায় :

> The period of Mughul imperial rule over Bengal witnessed the working of certain new forces which have completely transformed Bengali life and thought and whose influence is still operating in the province. In one word during the first

Scanned with CamScanner

century of Mughul rule (1575-1675 A. D.) the outer world came to Bengal and Bengal went out of herself to the outer world, and the economic social and cultural changes that grew out of this mingling of peoples mark a most important and distinct stage in the evolution of modern Bengal.[৮১]

বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদনা ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস অধ্যয়ন এবং গবেষণা করতে গিয়ে যদুনাথ একটি মূল্যবান ফারসি পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এটা হলো সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে বাংলাদেশে অবস্থানকারী উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা মীর্যা নাথনের লেখা বাহারস্তান-ই-গায়েবী। ফ্রান্সের প্যারিস গ্রন্থাগারের তালিকায় এটি একটি উপন্যাস হিসেবে তালিকাভুক্ত ছিল।

ভারতীয় ইতিহাসের সুদীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা দু'টি গ্রন্থ যদুনাথের ইতিহাস-গবেষণা ও অনুশীলনের দৃষ্টির প্রসারতার পরিচয়বাহী। গ্রন্থ দু'টি হলো *India Through the Ages* এবং *Military History of India* প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে।[৮২] এই গ্রন্থে সুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতে ব্রিটিশশক্তির পতন পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও ভাবনার বিকাশপ্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থের মোট সাতটি অধ্যায়ে রয়েছে ভারতের আর্যজাতি ও তাদের উত্তরাধিকার, বৌদ্ধবাদের কর্মকাণ্ড ও তার ইতিহাস, মুসলমানদের আগমন, বসতি স্থাপন ও প্রভাব, ইংরেজশক্তির অবদান, ব্রিটিশ ভারতে নবজাগরণ ও প্রভাব, ব্রিটিশশক্তির বিদায় প্রভৃতি বিষয়। প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন জাতির অবদানকে যদুনাথ সরকার বস্তুনিষ্ঠভাবে মূল্যায়ন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> When we make a broad survey of India's evolution through the last four thousands years we can not miss the four great landmarks that standout prominent and clear in this expanse of time. Four distinct races or creeds have each in its own age, determinded this country's destiny. The Vedic Aryans, the Buddhists, the Musalmans and the British have each introduced a new element into India, each of them has conferred gifts which have worked through the succeeding ages and modified our life and thought no less then our political history.[৮৩]

বস্তুত গ্রন্থটি ছোট হলেও এখানে যদুনাথের চিন্তা ও ভারতের ইতিহাসের প্রতি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখানে তিনি ভারত-আত্মার মূলধারার অনুসন্ধান করেছেন। কে আর কানুনগো বলেন, এই গ্রন্থ যদুনাথের ইতিহাসশাস্ত্র অনুশীলনে অসাধারণ দক্ষতা প্রমাণ করে।[৮৪] তিনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন কিভাবে ঐতিহাসিক যুগ পরম্পরায় গ্রহণ বর্জন ও সমন্বয়ের ভেতর দিয়ে

ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। যদুনাথের লেখা *Military History of India* প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে, তাঁর মৃত্যুর পর। অসমাপ্ত এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যদুনাথ বলেন যে, এই গ্রন্থ ভারতবর্ষে যুদ্ধকৌশল বিকাশের উপর গবেষণা। এই ভূমিতে ঘটে যাওয়া সকল যুদ্ধের বর্ণনামূলক তালিকা এটা নয়। এখানে কেবল এমন সব যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, যা সামরিক ইতিহাসের ছাত্রকে কি করতে হবে, বা কি করতে হবে না, তা শিক্ষা দিতে পারে।[৮৫] এই গ্রন্থে মোট একুশটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান কিভাবে সামরিক কৌশলকে প্রভাবিত করে, ভারতের প্রেক্ষিতে তার বিবরণ। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে রয়েছে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার ও তাঁর প্রতিপক্ষ পুরুর সামরিকবাহিনীর তুলনামূলক আলোচনা, পুরুর সাথে আলেকজান্ডারের যুদ্ধকৌশল, ভারতে তুর্কি দের যুদ্ধ ও সামরিক সংগঠন, বাবর, হুমায়ুন, শের শাহের আমলে যুদ্ধ ও সামরিক বিষয়াদি, মুঘলদের সামরিক ব্যবস্থাপনা, মারাঠাশক্তির যুদ্ধবিদ্যার কৌশল প্রভৃতি বিষয়। ভারতের প্রাচীনকাল থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সামরিক ইতিহাসের একটি অনবদ্য গ্রন্থ। যদুনাথের লেখা এই গ্রন্থটির প্রধান গুরুত্ব হলো এই যে, ভারতে এটা প্রথম এই ধরনের গ্রন্থ।[৮৬] ভারতীয় যুদ্ধকৌশল ও সামরিক সংগঠনের ইতিহাসে মুঘল সম্রাট আকবরের অবদানকে মূল্যায়ন করে যদুনাথ বলেন যে, এই আমলে দিল্লির সামরিকবাহিনীতে চরিত্র ও সাংগঠনিক দিক থেকে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।[৮৭]

সমকালীন ইতিহাস নিয়ে লেখা যদুনাথের গ্রন্থ *Economics of British India* তাঁর ইতিহাস অনুশীলন ও গবেষণায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন।[৮৮] যদুনাথ সরকারের ইতিহাস-সাধনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি দু'টি কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এই গ্রন্থে ব্রিটিশশাসনের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়ত ইতিহাসশাস্ত্রের সাথে অর্থনীতি যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটা প্রমাণ করে যদুনাথ ইতিহাস-গবেষণায় পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯০২ সালে প্রকাশিত রমেশচন্দ্র দত্তের লেখা *The Economic History of India* গ্রন্থটি দ্বারা যদুনাথ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রধান ঘটনা। গ্রন্থের মোট নয়টি অধ্যায়ে ভারতবর্ষের ভূমি, জনগণ, রাষ্ট্র, উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন, মুনাফা, বিনিময় এবং সরকারি অর্থ কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ইতিহাসের তথ্যাদি প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন :

> In the economic sphere we must face facts, however unpleasant they may be, we must take things as we find them

Scanned with CamScanner

and not wait till they are as we wish them to be. Otherwise our eyes be ever traced backwards.[৮৯]

গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোকপাত প্রসঙ্গে কে আর কানুনগো বলেন যে, ইতিহাসবিদের অকাঠ্য যুক্তি, তথ্য ও উপস্থাপনার স্টাইলের জন্য সমগ্র ভারতে সাধারণ পাঠক ও অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে গ্রন্থটি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সমাদৃত হয়।[৯০]

আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে লেখা যদুনাথের একটি গ্রন্থ হলো *A History of Jaipur*.[৯১] সর্বমোট ৩০টি অধ্যায়ে জয়পুর রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণ, জনগণ, রাজবংশের উত্থানসহ আধুনিক কালের জয়পুরের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। জয়পুরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে যদুনাথের মন্তব্য উদ্ধৃত করলে এই আঞ্চলিক ইতিহাস-গ্রন্থটি লেখার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। তাঁর ভাষায় :

> In the wealth of its government, people and culture Jaipur has enjoyed an undisputed first place in Rajputana for more than two centuries. Above all the rulers and statesman of this kingdom have played a part in the shaping of Indian history unparalled by any other state or clan.[৯২]

গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি যদুনাথ সরকার অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। একটি হলো *A New History of Indian People* (Vol. VI).[৯৩] H. S. Jarrett অনূদিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যদুনাথ সম্পাদনা করেন।[৯৪] মোট চৌদ্দ খণ্ডে প্রকাশিত *English Records of Maratha History : Poona Residency Correspondence*-এর তিনটি খণ্ড যদুনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।[৯৫] শেষজীবনে যদুনাথ মহেন্দ্রনাথ করনের লেখা *হিজলীর মসনদ-ই-আলা* (প্রকাশকাল ১৯৫৮) গ্রন্থটি পরিমার্জন ও সম্পাদনা করেছিলেন।[৯৬] যদুনাথের অনুবাদকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো *Persian Records of Maratha History*, Vol-I (প্রকাশকাল ১৯৫৩), Vol-II (প্রকাশকাল ১৯৫৪), *Bengal Nawabs*.[৯৭] এবং *মাসির-ই-আলমগিরী* (প্রকাশকাল ১৯৪৭) প্রভৃতি।

গবেষণাকর্মের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ধরণ

একজন ঐতিহাসিকের মননশীল ইতিহাস-সাধনার ভেতর দিয়ে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব ভঙ্গি গড়ে উঠে। যদুনাথের বিশাল কর্মপ্রবাহে গবেষণাকর্মের বর্ণনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি ধারা গড়ে উঠেছিল। ইতিহাস-বর্ণনায় যদুনাথের অবলম্বিত পদ্ধতিসত্তা ও বৈশিষ্ট্যে মৌলিক এবং সমুজ্জ্বল। কোন দেশ জাতি বা সমাজ বিকাশের উপর ভৌগোলিক প্রভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। মানুষের উৎপাদনপদ্ধতি, কর্মপ্রক্রিয়া, জনগোষ্ঠীর মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র প্রাকৃতিক

পরিবেশনির্ভর। একটি অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি নির্মাণে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ামক-শক্তি হিসেবে কাজ করে। যদুনাথ সরকার ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে প্রকৃতি আর মানুষের মাঝে সম্পর্কের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। মারাঠা জাতির উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে যদুনাথ বলেন :

> The Maratha peoples in bron love of independence and isolation was greatly helped by nature which provided them with many ready and easily defensible forts close at hand, when they could quietly flee refuse and where they could offer a teracious resistance.[৯৮]

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থান ছিল বলে আত্মবিশ্বাস মারাঠা-চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মহারাষ্ট্রের প্রকৃতি মারাঠাদের বিজয়ের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। অন্যদিকে গুজরাটের নিত্য শুষ্কতা, খরা, পাথর ও বালুময় মাটি জনগণকে কৃষিবিমুখ করে তোলে। ফলে জমি কর্ষণের চেয়ে দুর্বল ও ধনীদের উপর লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের জন্য অধিকতর লাভজনক।[৯৯] এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য গুজরাটের আর্থ-সামাজিক কাঠামো এবং জীবনধারাকে প্রভাবিত করেছিল। গুজরাট সম্পর্কে তিনি বলেন, পর্যটক ও বণিকদের জন্য গুজরাটের রাস্তাঘাট নিরাপদ নয়, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতিশীল পরিস্থিতি, দারিদ্র্যের কারণে শিল্পায়নে অনগ্রসরতা এবং সম্পদের সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান।[১০০] উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের গতি ভিন্নমাত্রিক হওয়ার প্রধান কারণ ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভেদ। যেকোনো অঞ্চলের ইতিহাস-গবেষণা ও অনুশীলনে যদুনাথ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে সর্বপ্রথম চিন্তা করেছেন এবং প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়ে লেখনী শুরু করেছেন। পরিবেশের সাথে ইতিহাসের সম্পৃক্তকরণ যদুনাথের ইতিহাস লেখার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একই সঙ্গে বাংলা তথা ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বে এক নতুন ধারার অগ্রিম অনুশীলন।

ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে যুদ্ধবিগ্রহ ও সংঘাত ছিল অনেকটা সাধারণ রাজনৈতিক ঘটনা। তাই মধ্যযুগের ইতিহাস-গবেষণায় যুদ্ধের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক ও অনুষঙ্গী। যুদ্ধের বর্ণনা প্রদানের ক্ষেত্রে যদুনাথ সরকার ভারতীয় ইতিহাসে অদ্বিতীয়।[১০১] যুদ্ধক্ষেত্রে বিবদমান পক্ষগুলির উপস্থিতি, শক্তি, স্থিতি, নেতৃত্ব, যুদ্ধাস্ত্র, ভৌগোলিক ও কৌশলগত অবস্থান, যুদ্ধকৌশল, বিবদমান পক্ষগুলির সুবিধা-অসুবিধা এবং জয়-পরাজয়ের সামগ্রিক বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে যুদ্ধক্ষেত্রে ভাগ্য নির্ধারণের জন্য উন্নত জাতিসত্তা ও জ্ঞানালোক এবং শৃঙ্খলা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের প্রসঙ্গ তুলে যদুনাথ বলেন, প্রাচীন পৃথিবীর সভ্যতম জাতির বুদ্ধিমত্তায় মেসিডোনীয় বাহিনী উদ্ভাসিত ছিল। আলেকজান্ডার নিজেই ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটলের ছাত্র। তাঁর সাথে ভারতঅভিযান বিজ্ঞানী, দার্শনিক,

Scanned with CamScanner

চিকিৎসক, প্রকৌশলীরা অংশগ্রহণ করেছিল।[১০২] ভারত ও গ্রিকশক্তির সামরিক ভারসাম্য পর্যালোচনা করে যদুনাথ লিখেন :

> When we come to compare the arms and equipment on the two sides, we feel as if man of bamboo age were fighting of the steel age.[১০৩]

যদুনাথের সিদ্ধান্তে এটা স্পষ্ট যে, গ্রিকশক্তির মোকাবেলায় তৎকালীন ভারতের নেতৃত্ব ও যুদ্ধাস্ত্র ছিল দুর্বল ও অনুপযুক্ত। বস্তুত এই দুর্বলতার সুযোগে ভারতবর্ষ বারবার বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বহু বিদেশী বিজেতা ভারতভূমিতে বিজয়ী বেশে পদার্পণ করেছেন। ১৩৯৮ সালে তৈমুরের ভারত-বিজয়ের সামরিক পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন যে, ১১৯২ সাল থেকে ১৫২৬ সাল পর্যন্ত উত্তর ভারতের তুর্কি শাসকরা বিজয়ের অভিযাত্রা অব্যাহত রেখেছিলেন, রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সুসংহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল এবং বিকাশপ্রক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ার পটভূমিতে তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন।[১০৪] ভারতের তুর্কি রাজশক্তি এতই দুর্বল ছিল যে তৈমুরের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। একটি রাষ্ট্র বা জনগোষ্ঠীর জীবনের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে, সংস্কৃতির বিকাশে এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর যুদ্ধবিগ্রহ গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যদুনাথ যুদ্ধের ফলাফলকে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করেছেন। ১৫৬৫ সালের ৫ জুন সংঘটিত তালিকোটার যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেন :

> Talikota is rightly called the most dicisive battle of south India. It effected a revolutionary change in the history of entire Deccan. It shattered the great Vijaynagara empire into fragments, turned the splendid capital into a desolate wilderness and left the hindus of Southern India so disunited and crushed that they could never again raise their heads in full sovereignty.[১০৫]

অর্থাৎ ১৫৬৫ সালের ৫ জুনের তালিকোটার যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে একটি দিকনির্ধারণকারী যুদ্ধ। এই যুদ্ধ দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। এর ফলে শক্তিশালী বিজয়নগর রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুসমাজ এতটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে যে, তারা আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। যদুনাথ লক্ষ করেছেন যে, কোনো অঞ্চলের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যহীনভাবে কোনো সামরিকবাহিনী টিকে থাকতে পারে না। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামরিকবাহিনীর নতুন বিন্যাস অত্যন্ত জরুরি। তাঁর মতে ভারতের মুঘল সামরিকবাহিনীর দ্রুত অবক্ষয়ের কারণ হলো তুর্কি সামরিকবাহিনীর ভারতেও তুর্কি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকা। ফলে ভারতের মাটিতে এই বাহিনী দ্রুত

পতনের দিকে ধাবিত হয়।[১০৬] অবশ্য যদুনাথ জাতীয় জীবনে অতিরিক্ত সামরিক প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন।

যদুনাথের ইতিহাস-গবেষণা ও লেখনী পরিচালনায় একটি প্রধান দিক হলো সামগ্রিক দিক থেকে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন। ইতিহাসের কোন ঘটনাকে তিনি পূর্বাপর অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। কালের ঐতিহাসিক প্রবাহে যদুনাথ সমাজ ও সংস্কৃতিতে সকল জাতির অবদানকে মূল্যায়নে প্রয়াসী। তাই তাঁর ইতিহাস-বর্ণনায় একটি পুরো চিত্র সহজেই চোখে পড়ে। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত আওরঙ্গজেবের ইতিহাস তিনি শুরু করেছেন সম্রাট শাহজাহানের সময়কাল থেকে। রাজনীতি, কূটনীতি, প্রশাসন, যুদ্ধ অভিযান, বিদ্রোহ দমন, ব্যক্তিগত যোগ্যতা, গৃহীত নীতিমালা, শিল্প, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের কোনোটিই যদুনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি। আওরঙ্গজেবের শাসনামলের প্রথমার্ধে দক্ষিণ ভারত তাঁর প্রশাসনকে প্রভাবিত না করলেও সাম্রাজ্যের ভাগ্যকে প্রভাবিত করেছিল। শিবাজী, মারাঠা জাতি, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে বলে যদুনাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[১০৭] রাজনীতি, প্রশাসন পরিচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে ব্যক্তিজীবনের অবস্থা যদুনাথের দৃষ্টি এড়ায়নি। মূলত ব্যক্তিজীবন, সমাজ ও ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে যদুনাথ বলেন :

> In addition to the failure of his rule, Aurangzib's domestic life was loveless and dreary and wanting in the bering peace and cherfulness and the kinded warmth which throw a halo round old age.[১০৮]

সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন ধারায় বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার, আচরণ, ভাষা, জীবনধারা একে অপরকে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষভাবে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই সত্যটি প্রযোজ্য। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ প্রক্রিয়ায় মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে যদুনাথ বলেন যে, মুসলিম-শাসনের ছয় শত বছরের ফল ভারতবাসীর দেহের ও মনের অংশ হয়ে আছে।[১০৯] ভারতে আগত সকল জাতির অবদানকে মূল্যায়ন করে তিনি আরও বলেন :

> Each race or creed that has chosen India for its home, each dynasty that has enjoyed settled rule among us for sometime, each school of thought that has dominated the human mind even in a single province of india–has left its gifts which have worked in all the province and through many centuries.[১১০]

মুঘলসাম্রাজ্য পতনের জন্য যদুনাথ ব্যক্তি আওরঙ্গজেবকে এককভাবে দায়ী করেননি। তিনি তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মুঘলসাম্রাজ্যের পতনকে বিশ্লেষণ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। তাঁর ভাষায়—

Scanned with CamScanner

Politically therefore Aurangzib with all his virtues was a complete failure. But the causes of the failure of his reign lay deeper than his personal character. Though it is not true he alone caused the fall of the Mughul empire, yet he did nothing to avert it. but rather quickened the destructive forces already in operation in the Land.[১১১]

রাজনৈতিকভাবে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামল সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। কিন্তু এই ব্যর্থতার কারণ তার ব্যক্তিগত চরিত্রের চেয়ে আরও গভীরে নিহিত। ধ্বংসকারী শক্তি ভারতভূমিতে তৎপরতায় লিপ্ত হলেও প্রতিহত করার ক্ষমতা আওরঙ্গজেবের ছিল না। বস্তুত উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতি, নতুন জীবনদর্শন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, ইহলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি, মানবশক্তির অমিত সম্ভাবনায় আস্থাশীল ইউরোপীয় জাতিসমূহ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে এশিয়া আফ্রিকার দেশসমূহ ইউরোপীয়দের উপনিবেশে পরিণত হয়। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রকাঠামো, পশ্চাদপদ আর্থ-সামাজিক জীবনধারা, স্থবির ও নিশ্চল অর্থনীতির দেশ ভারতবর্ষকে ইংরেজশক্তি পদানত করে। অবশ্য ভারতীয় ইতিহাসের মুঘল রাজশক্তির পতন হলেও এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মুঘলশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। যদুনাথ মনে করেন যে, সমগ্র ভারতে এককেন্দ্রিক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, সরকারি ভাষা প্রচলন, একক মুদ্রাব্যবস্থা, জনকল্যাণ ইত্যাদির মাধ্যমে মুঘলরা ভারতে এক উচ্চমানের সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল।[১১২]

ইতিহাসবর্ণনা ও বিশ্লেষণে যদুনাথের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ইতিহাসের যে-কোনো বিষয়ে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণদের অবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

The Ancient Brahmans enjoyed popular veneration and social supremacy, but they used their influence and prestige solely for the promotion of learnning and religion and not for enriching themselves or gratifying their passion. The nation as a whole benefited by this arrangement. But it was impossible only in a purely hindu state without a dense population and with science and technical arts in a simple undeveloped conditionl.[১১৩]

ভারতে মুসলিম-শাসনামলের সুফি মতবাদকে যদুনাথ ভারতীয় ইতিহাসের বিকাশধারায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। সুফিবাদের মূল প্রকৃতি সম্পর্কে যদুনাথের সিদ্ধান্ত হলো নিম্নরূপ :

It was essentially a faith or rather an intellectual emotional enjoyment, reserved for philosophers authors and mystics free from bigotry. The Eastern variety of sufism is mainly an offshott of the Vedenta of the hindus and it rapidly spread and developed in India from the time of Akbar, under whose fostering care hindu muslim thought formed at close union with help from many persian emigrants of liberal view.[১১৪]

অর্থাৎ সুফি মতাদর্শ হলো গোঁড়ামি থেকে মুক্ত দার্শনিক, লেখক ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের বিশ্বাস কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড। পারস্য থেকে আগত উদার মতাবলম্বীদের প্রভাবে মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে হিন্দুমুসলিম সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ার পটভূমিতে এই মতবাদ দ্রুত বিকশিত হয়। এটা ছিল ভারতের বেদান্ত মতাদর্শেরই অংশ। মূলত সুফি মতবাদ ছিল ভারতের উদারপন্থী হিন্দুমুসলিমদের ধর্মীয় পন্থা। উভয় ধর্মের গোঁড়ামি, অন্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, উভয় ধর্মের ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের বিপরীতে এই মতবাদ ছিল সমন্বয়ধর্মী ও মানবতাবাদী। গোঁড়ামি পরিহার করে ঈশ্বরের বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রেখে মানবমিলনের জয়গান ঘোষিত হয় সুফিদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে। ভারতে ব্রিটিশশাসনের ফলাফলকে যদুনাথ ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। তাঁর ভাষায় :

The economic change can be summed up by saying that British rule has modernised India and made her free from the medieval spirit. The most noticeable features of this new India is that the country is no longer isolated but has been connected with the whirlpool of the world commerce and speculation.[১১৫]

অর্থাৎ ব্রিটিশশাসনের ফলে অর্থনৈতিকভাবে ভারতবর্ষে আধুনিকায়ন শুরু হয় এবং মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে। এই নতুন ভারতের বৈশিষ্ট্য হলো—তা পূর্বের মতো বিচ্ছিন্ন নয়। বরং বিশ্ববাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ব্রিটিশশক্তির নিয়ে আসা পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্ক ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে। ব্রিটিশশাসনের অভিঘাতে ভারতের মধ্যযুগীয় সমাজকাঠামো ভেঙ্গে পড়ার পটভূমিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের যাত্রা শুরু হয়।

ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ, ঐতিহাসিক স্থান, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণের পাশাপাশি যদুনাথ তাঁর গবেষণাকর্মে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এই সকল চরিত্রের রূপায়ণ ও মূল্যায়নে তিনি মৌলিক তথ্যের উপর নির্ভর করেছেন। যদুনাথের ঐতিহাসিক চরিত্র উপস্থাপন প্রসঙ্গে কে আর কানুনগো বলেন :

Scanned with CamScanner

Jadunath's historical characters owe their brilliancy and vivacity as well as their photographic realism to his skill in presenting them with charming make up, an art which no master can teach his pupil, a gift endowed by nature.[১১৬]

ইতিহাসের উপাদান ও প্রয়োগ

ইতিহাসের প্রামাণ্যতা নির্ভর করে সঠিক তথ্যের উপর। উপাদান সংগ্রহ ও বাস্তব প্রয়োগ ইতিহাসকে বস্তুনিষ্ঠ করে তোলে। ইতিহাসের জন্য প্রাপ্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস, শ্রেণীকরণ, সত্যতা যাচাই এবং উপস্থাপন প্রভৃতি বিষয়সমূহের উপর ইতিহাসবিদের কৃতিত্ব নির্ভর করে। মুঘল তথা মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস-রচনায় তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদুনাথ অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর সামগ্রিক ইতিহাস-গবেষণায় এগারো ধরনের উৎস তিনি ব্যবহার করেছেন। এগুলো হলো—১. রাজদরবারকেন্দ্রিক ইতিহাস, ২. ব্যক্তিগত ইতিহাস, ৩. মনোগ্রাফ, ৪. সরকারি দলিলপত্র, ৫. ডায়েরি, ৬. বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, ৭. ইউরোপীয়দের অফিস রেকর্ড, ৮. প্রাদেশিক ইতিহাস, ৯. দরবার ফরমান, ১০. চিঠিপত্র ও ১১. ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ারস। যদুনাথের মতে মুঘল-ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সমস্যা হলো তথ্যের প্রামাণিক উৎস খুঁজে বের করা।[১১৭] এই কষ্টসাধ্য কাজে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। এই সম্পর্কে যদুনাথের উক্তি উদ্ধৃত করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে :

> নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, কোন একজন দিল্লির বাদশাহ অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথমে দশ বছর ধরে তার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়েছে; সেগুলি সাজিয়ে সংশোধন করে, আলোচনা করে মনের মধ্যে হজম করে দশ বছর ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি তার আগে নয়।[১১৮]

সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করে ইতিহাসের তথ্যসংগ্রহের জন্য যদুনাথ মহারাষ্ট্রে চল্লিশ বার, আগ্রা, দিল্লী, মালোয়া, রাজপুতনা ইত্যাদি স্থানে দশ-বারো বার করে ভ্রমণ করেন।[১১৯] তাঁর মতে মৌলিক ও প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ ছাড়া ইতিহাস-গবেষণা কখনোই সফল হতে পারে না। মৌলিক তথ্যসংগ্রহের জন্য মারাঠা ঐতিহাসিক বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজাওয়ারার প্রশংসা করে বলেন :

> The first and most indispensable condition of historical research is access to original documents. He also collects old state papers and other sources of history, therefore makes research possible and he benefits unborn generations of students by saving these unique records from destructions and dispersion. In addition to this he prints the records. He confers a still greater benefit and extends that benefit to a wider circle of scholars which may embrace the whole world.[১২০]

এই মারাঠা ঐতিহাসিকের তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের প্রতি যদুনাথের নিজস্ব মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। ইতিহাসের তথ্যের সাথে সম্পর্কিত হলো ভাষা। কোন অঞ্চলের ইতিহাসের উপাত্ত, মালমসলা ঐ অঞ্চলের ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। উপরন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য বা ঔপনিবেশিক সূত্রে ভিন্নদেশী ভাষা একটি অঞ্চলের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য মৌলিক তথ্যের যোগান দিয়ে থাকে। ইতিহাসের মৌলিক উৎস সন্ধানের জন্য ভাষাজ্ঞান অপরিহার্য শর্ত। যদুনাথ ইতিহাসের তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উৎসের ভাষা জানার জন্য সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন।[১২১] তিনি অনেকগুলি ভাষা থেকে মূল তথ্য সংগ্রহ করতেন। যদুনাথ ফারসি, মারাঠী, পর্তুগিজ প্রভৃতি ভাষা শিখেছিলেন।[১২২] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ইতিহাস-রচনায় মূল উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে যদুনাথ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী।[১২৩] এই প্রসঙ্গে সুশীল রায় বলেন যে, ইতিহাস লিখতে গিয়ে যদুনাথ আদি ভাষায় উপাদান সংগ্রহ, সব ধরনের ভাষা থেকে তথ্য আহরণ, উপাদানকে পরীক্ষা করে মূল সত্য আবিষ্কার, ক্রমাগত সংশোধন এবং নতুন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধারে ব্রতী হতেন।[১২৪]

ইতিহাসের উৎস উপকরণ ও তথ্যসংক্রান্ত পদ্ধতিবিদ্যার ক্ষেত্রে যদুনাথের একটি প্রধান দিক হলো প্রাপ্ত তথ্যের বাছাই এবং সেগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারণ করা। কেননা তথ্য মাত্রই ইতিহাস লেখার উপযোগী নয়। উপরন্তু সকল তথ্যের গুরুত্বও সমান হয় না। ইতিহাসের যে-কোনো তথ্যের স্থানকালপাত্র নির্ধারণের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখের বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর ভাষায় :

> It would be sheer fantasy to imagine that for each historical problem them is a unique type of document with a specific sort of use.[১২৫]

এটা অনস্বীকার্য যে, ইতিহাসের উপকরণের স্থানকালপাত্র ভেদে মূল্যায়ন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদুনাথ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিপুল মৌলিক তথ্যের সমাহার যদুনাথকে আওরঙ্গজেবের ইতিহাস-গবেষণায় উদ্দীপিত করেছিল। কে আর কানুনগো বলেন—

> আওরঙ্গজেবের ইতিহাস সম্বন্ধে কাফি খার মুন্তাখাব-উল-লুবাবিখ ব্যতীত অন্যান্য পুঁথি তখনো প্রায় অজ্ঞাতবাসেই ছিল। আওরঙ্গজেবকে মসীবর্ণে চিত্রিত করবার সম্বল এদেশে ও বিলাতে একমাত্র কাফী খা। অধিকন্তু এই সময় উইলিয়াম আর্ভিন মুঘল দরবারের দৈনিক সংবাদ তালিকার (*আখবারাত-ই-দরবার-ই-মৌলা*) সন্ধান পাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত

Scanned with CamScanner

যদুনাথের পত্রালাপ ছিল। এই সমস্ত আনকোড়া কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়া অনন্য মুখাপেক্ষী এবং অভিনব ইতিহাস-রচনা করিবার সুযোগ যদুনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১২৬]

অতএব এই বিশাল তথ্যের রাজ্য থেকে বাছাই ও তথ্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি ছিল জরুরি। এই জন্য যদুনাথ প্রতিটি পৃষ্ঠার বর্ণনা লেখার পূর্বে সব তারিখসহ প্রত্যেকটি বিষয় খুবই সতর্কতার সাথে মিলিয়ে দেখতেন।[১২৭]

মুঘল ইতিহাস তথা মধ্যযুগীয় ভারতীয় ইতিহাসের মৌলিক উৎস হলো ফারসি পাণ্ডুলিপিসমূহ। যদুনাথ সরকার এই পাণ্ডুলিপিগুলিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। তিনি বলেন যে, মুঘল যুগের সরকারি ইতিহাসগুলিতে অসংখ্য ছোট ছোট ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তারিখ স্থান আর লোকের নাম দিয়ে মাস ও বছর অনুসারে প্রত্যেক সম্রাটের রাজত্বকালের সুদীর্ঘ ইতিহাস লেখা হয়েছে।[১২৮] বস্তুত এই কালের অনেক ঘটনার প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যায় এইসব পাণ্ডুলিপিতে। ফারসি পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করতে গিয়ে যদুনাথ মধ্যযুগীয় ইতিহাস-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগী হয়ে পড়েন। গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত-অভিযান থেকে শুরু করে মুঘলসম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম পর্যন্ত ভারতের কোনো না কোনো অংশ নিয়ে রচিত ইতিহাসসাহিত্যকে তিনি মহাসমুদ্রের মত প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেন।[১২৯] প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এই সকল ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেই দরবারকেন্দ্রিক ছিলেন। মুঘল রাজদরবারের বিভিন্ন দল বা উপদলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তাদের ইতিহাস লেখায় এর প্রভাব ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস-গবেষণায় ফারসি পাণ্ডুলিপির মূল্য অপরিসীম। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘলসাম্রাজ্য পতনের যুগে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দরবারকেন্দ্রিক ইতিহাস-রচনায় ভাটা পড়ে। এই সময়ে রচিত পাণ্ডুলিপিসমূহ আকারে ছোট এবং তথ্যসমৃদ্ধ নয়। তথাপি এগুলো মুঘল ইতিহাসসাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। অষ্টাদশ শতকের ভারতের ইতিহাস-গবেষণায় এগুলির গুরুত্ব প্রসঙ্গে যদুনাথ সরকার বলেন, এইসব অকুলীন নবীন নামা আমাদের পক্ষে ডিব্বির আলো, এগুলিকে ছেড়ে দিলে কোনো কোনো রাজত্বকাল বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকারী একেবারে নিঃসম্বল অসহায় হয়ে পড়বেন।[১৩০]

ইতিহাসের উৎস উপাদান সংগ্রহকালে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি পরীক্ষানিরীক্ষার সময় যদুনাথ সরকার পাণ্ডুলিপির রচয়িতার ব্যক্তিগত অবস্থান, রচনার সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং সন্নিবেশিত তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার চেষ্টা করতেন। এখান থেকে ইতিহাসের তথ্য নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর তিন বছর পর মোহাম্মদ সাকী মোস্তায়িদ খান রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র ও ব্যক্তিগত স্মরণ থেকে তাঁর

শাসনামলের ইতিহাস (১৬৫৮-১৭০৭) লিপিবদ্ধ করেন। যদুনাথের মতে এই পাণ্ডুলিপিটি তারিখ, ব্যক্তি, স্থানের নাম, ঘটনাবলীর প্রকৃত পরিস্থিতি, সরকারি পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের জন্য অমূল্য উৎস।[১৩১] মুঘলসাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহের ইতিহাসের তথ্য হিসেবে 'সিয়ার-উল-মুতাখরিন' পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাটনার অধিবাসী এই পাণ্ডুলিপির লেখক শিক্ষা ও মননে উন্নত ছিলেন। তিনি চারটি অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একই সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সমকালীন সময়ে লেখা দু'জনের পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে যদুনাথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।[১৩২] এতে প্রমাণিত হয় যে, পাণ্ডুলিপির পাঠ ও তথ্য গ্রহণে যদুনাথ যুক্তিবাদী ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন।

ইতিহাস অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে চিঠিপত্র একটি প্রধান উৎস হিসেবে পরিগণিত। ইতিহাসের উপাদান হিসেবে চিঠিপত্রকে যদুনাথ বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর ভাষায়—

> চিঠি ও হস্তলিখিত সংবাদপত্র এগুলি গ্রন্থাপেক্ষাও অধিকতর মৌলিক ও মূল্যবান উপকরণ; ফলত আমি সর্বদাই এগুলিকে ভারত ইতিহাসের অসি মসলা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি।[১৩৩]

তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় তিন হাজার চিঠিকে তৎকালীন সরকারি বর্ণনা থেকে অধিকতর মূল্যবান উৎস বলে অভিহিত করেছেন।[১৩৪] ভারতইতিহাস প্রণয়ন করতে গিয়ে ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণকে যদুনাথ যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রদত্ত বিবরণ জনগণের অবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য এবং ভারতে খ্রিস্টান চার্চের ইতিহাসের জন্য মূল্যবান।[১৩৫] তাঁর মতে ইউরোপীয়দের বিবরণে উল্লিখিত রাজনৈতিক ইতিহাস বাজারের গুজব ও জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে লিখিত।[১৩৬] এইজন্য তিনি আওরঙ্গজেবের ইতিহাস-গবেষণায় বার্ণিয়ের ও মানুচ্চীকে অত্যন্ত সীমিতভাবে ব্যবহার করেছেন। ভারতে ইংরেজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি সম্পর্কে যদুনাথ ছিলেন সন্দিহান। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে লিখিত ফারসি ইতিহাস গ্রন্থগুলি সম্পর্কে তার অভিমত হলো—এগুলি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতার আত্ম-তৃপ্তিদানকারী মুসলমানদের লেখা।[১৩৭] তোষামোদপূর্ণ এই সকল গ্রন্থে ইতিহাস একপেশে ও বিকৃত। মারাঠাদের ইতিহাস-গবেষণায় যদুনাথ 'বখর' সাহিত্যের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। ইংরেজশাসন শুরু হওয়ার পূর্বে রাজা ও রাজন্যবর্গের নিযুক্ত মুন্সীদের রচিত কাহিনী, বংশ-কাহিনী ইত্যাদিতে ইতিহাসের সত্যতা কম। তবে শকাবলী, সরকারি জমাখরচের খাতা ও ডায়েরিতে ইতিহাসের কিছু সত্যতা রয়েছে।[১৩৮] ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত অঞ্চলটির মানুষ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে উপাদান সংগ্রহ করতেন। উৎস উপাদানের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার কারণে

Scanned with CamScanner

আওরঙ্গজেব, শিবাজী, মুঘলসাম্রাজ্যের পতন প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিপুল তথ্যের সমাহারে ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্বে অদ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।[১৩৯]

চিন্তাধারা ও চিন্তাগত প্রভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গি

একজন ঐতিহাসিককে মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি হলো কালের বাস্তব প্রেক্ষাপটে ইতিহাসশাস্ত্রের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন। মানুষের জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসার ধারায় বহুমুখী ও বিচিত্র অন্বেষা থেকে মনোজগতে চিন্তার দানাবন্ধন ঘটে। এই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট যুগ, যুগের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, রাষ্ট্র ও সমাজদর্শন, ভাববিপ্লব, সামাজিক বিপ্লব এবং সর্বোপরি পারিপার্শ্বিকতা প্রভাবশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, শ্রেণীগত ভিত্তি, চলমান জীবনান্দোলন মানসলোক গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক E H Carr-এর ভাষায় :

We can view the past and achieve our understanding of the past, only through the eyes of present. The historian of his own age and is bound to it by the conditions of human existance.[১৩৯ক]

অর্থাৎ আমরা অতীতকে দেখি ও বুঝতে শিখি বর্তমানের চোখ দিয়ে, ঐতিহাসিক তার যুগে অবস্থান করেন এবং তার যুগের প্রেক্ষিতেই ইতিহাস-ভাবনা গড়ে উঠে। বিশ শতকের বাঙালি ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ক্ষেত্রে এটা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। যদুনাথ আকস্মিকভাবে ইতিহাস-গবেষণায় আসেননি। পারিবারিক অনুকূল পরিবেশ ও অধ্যয়নের ভিতর দিয়ে পরিকল্পিতভাবে তিনি ইতিহাস লেখা ও গবেষণার জগতে প্রবেশ করেন। ইতিহাসের প্রতি যদুনাথের গভীর অনুরাগ সৃষ্টিতে তাঁর পিতার ভূমিকা স্মরণযোগ্য। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের সন্তান যদুনাথের পিতার সংস্কৃতির প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ এবং তিনি তার ছেলের মনে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে দেন।[১৪০] এই প্রসঙ্গে যদুনাথের স্মৃতিচারণ অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> ইতিহাস ছিল তার (যদুনাথের পিতার) প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রিক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল; আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হলো কি করলে কোন জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়।[১৪১]

যদুনাথের পিতা রাজকুমার সরকারের সংগ্রহে ইউরোপীয় ইতিহাসের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ছিল। অধিকন্তু, তৎকালীন সময়ের বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে রাজকুমারের যোগাযোগ ছিল। বিশেষত জোড়াসাকোঁর ঠাকুর পরিবারের দেবেন্দ্রনাথের সাথে রাজকুমারের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক উল্লেখ করা যায়। ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের

ছাত্র হওয়ার কারণে ইউরোপের ইতিহাস যদুনাথকে গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে হয়। তখনো পর্যন্ত ইতিহাস ও সাহিত্য ছিল পরস্পরঘনিষ্ঠ। এই সূত্রে তিনি ছিলেন গ্রিন, কার্লাইল, মেকলে, গীবন, ক্লারেন্ডন, রবার্টসন, ফ্রাউদে, হিউম, র‍্যাঙ্কে, মমসেন, লর্ড এ্যাকটন, লেকী প্রমুখ ইতিহাসবিদ ও লেখকদের একনিষ্ঠ পাঠক। পাশ্চাত্য ইতিহাস-ভাবনা যদুনাথের মাঝে ইতিহাসের প্রতি অন্তঃদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি এনে দেয়। প্রধানত এই পটভূমিতে তিনি উনিশ শতকের ইউরোপের ইতিহাসতত্ত্বের সাথে পরিচিত হন। কে আর কানুনগোর ভাষায় এভাবেই যদুনাথ উনিশ শতকের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের বুদ্ধিবৃত্তিক শিষ্যে পরিণত হন।[১৪২] বস্তুত এই পটভূমিতে উনিশ শতকের যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রবল অনুসন্ধিৎসা এবং জ্ঞানালোক প্রবাহ থেকে গড়ে উঠেছিল যদুনাথের মানসলোক। ইউরোপের ইতিহাসতত্ত্বের বিকাশধারায় উনিশ শতকের শেষদিকে দর্শন ও সাহিত্যের প্রাধান্য থেকে মৌলিক তথ্যভিত্তিক ইতিহাসচর্চা প্রাধান্য পেতে থাকে। কল্পনার জগৎ থেকে তথ্যের জগতে উত্তরণ ঘটার মধ্য দিয়ে মানবিক জ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত ইতিহাস হয়ে উঠে বিজ্ঞান। ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বের এই নতুন ধারায় নেতৃত্ব করেন জর্জ নিবুর, ভন র‍্যাঙ্কে, থিওডর মমসেন প্রমুখ ইতিহাসবিদগণ। পাশাপাশি ঐতিহাসিক মেকলে ও ট্রাভেলিয়ন প্রদর্শিত রীতি History as literature এবং কার্লাইল প্রদর্শিত রীতি History as biography বিদ্যমান ছিল। একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ইতিহাস-গবেষণায় সহযোগী হয়ে উঠে। ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বের উপরিউক্ত চারটি ধারার সাথে যদুনাথের পরিচয় ছিল। যদিও তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ভারত-ইতিহাস, তথাপি তিনি পাশ্চাত্য ইতিহাসতত্ত্বের যোগ্য সন্তান।[১৪৩] ফরাসি বিপ্লবি যদুনাথকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর নিজের ভাষায় 'ইউরোপের ইতিহাসে আমার প্রিয় হলো ফরাসি বিপ্লব ও নেপোলিয়নের যুগ।'[১৪৪]

যদুনাথের ইতিহাস-ভাবনায় মানুষের প্রতি মমত্ববোধ একটি উল্লেখযোগ্য দিক। মানবশক্তি ও সম্ভাবনার উপর আস্থাশীল যদুনাথ মানবসভ্যতার ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসেবে দেখেছেন মানুষকে। সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং বিবর্তনে মানুষের সম্মিলিত মেধা ও শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইজন্য সমাজবদ্ধ মানুষের ইতিহাসই হলো প্রকৃত ইতিহাস। যদুনাথের মতে কোনো বিশেষ ব্যক্তি, শাসক বা রাজার ইতিহাস দেশের বা সমাজের সামগ্রিক ইতিহাস নয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো—

> উপরের সর্বশক্তিমান কর্তা, কোন মুসোলিনী বা আলাউদ্দীন খলজী হুকুম দিয়া সমস্ত দেশবাসীদের ক্রীতদাসের মত একটি পথ বিশেষে চালাইলেন, ইহাতে নেশন গঠিত হয় না। এইরূপ প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হয় না। উহা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম জিনিস।[১৪৫]

Scanned with CamScanner

রাজা বা শাসকের ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট সময়ের কোন সমাজের বা দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে আংশিক আলোকপাত করে মাত্র। শুধুমাত্র রাজা বা রাজনৈতিক পরিবর্তন ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য নয়। যদুনাথ মনে করেন যে শুধুমাত্র রাজা, রাজ্য পরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহই ইতিহাস নয়। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ ও তার গায়ের চামড়াটি সহজেই চোখের সামনে আনা যায়, কিন্তু তার হৃদয়টি দেখাতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না।[১৪৬] এই হৃদয়টি হলো মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও বহুমুখী সৃজনকর্মের ইতিহাস। উদার ও মুক্ত সমাজ ছাড়া মানুষের শক্তির বিকাশ হয় না। মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ, শোষণ, নির্যাতন তার সমূহ সম্ভাবনাশক্তিকে নস্যাৎ করে দেয়। আওরঙ্গজেবের আমলে জনগণের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বেদনার সঙ্গে যদুনাথ বলেন :

> Then the only life that the hindus could lead under Aurangzib was life deprived of the light of knowledge, deprived of the consolation of religion, deprived of social union and public rejoicing, of wealth and self confidence that is begotten by the free exercise of natural activities and use of opportunities—in short a life exposed to constant public humiliations and public disabilities.[১৪৭]

আওরঙ্গজেবের গৃহীত নীতিমালা সামাজিক জীবনে স্থবিরতা নিয়ে আসে। হিন্দুসমাজের সৃজনীশক্তি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয় বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের পরিপন্থী আওরঙ্গজেবের নীতিগুলিকে যদুনাথ সমালোচনা করেছেন। দেশের সামগ্রিক মঙ্গল সাধনে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। যে-কোনো সমাজের আভ্যন্তরীণ বিকাশ, জাতীয় জাগরণ, প্রতিকূলতাকে মোকাবেলা সকল মানুষের সমন্বিত প্রচেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। ইতিহাসে জাতীয় অভ্যুত্থানের পেছনে নিম্নবর্গের মানুষ প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। মারাঠাশক্তির উত্থান প্রসঙ্গে যদুনাথের অভিমত হলো জাতীয় জনসমষ্টির মধ্যে কতগুলি গুণ না থাকলে, সমস্ত দেশময় একটা জাগরণ দেখা না দিলে প্রবল মুঘলসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ এবং সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হতো না।[১৪৮]

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়নের ভিতর দিয়ে একজন ইতিহাস-গবেষকের মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদুনাথ সম্রাট আকবরকে মুঘল ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম শাসক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায় :

> আর যাহারা ভারত ইতিহাস জানেন, তাহারাই স্বীকার করিবেন যে, আকবর দেবতুল্য রাজা ছিলেন। তিনি ভারতে এমন দুইটি জিনিস দান করিয়াছিলেন যাহা আর কোন মুসলমান রাজার সময়ে পাওয়া যাইত না এবং যাহা বর্তমান সভ্য শাসন প্রণালীর চিহ্ন। সেই দুইটি হইতেছে

> সর্বধর্মের নিরপেক্ষ প্রতিপালন এবং সরকারী কাজে জাতি নির্বিশেষে গুণীর নিয়োগ অর্থাৎ ইংরেজীতে বলিতে গেলে Universal toleration এবং Career open to talent, তাহার উপর পাঠান-যুগের শত শত বর্ষব্যাপী মারামারি, বিদ্রোহ, খুন ও অরাজকতার পর আকবর উত্তর ভারতময় যে শান্তি স্থাপন করিলেন তাহা অশোক ও সমুদ্র গুপ্তের পরবর্তী হাজার বৎসরে দেখা যায় নাই।[১৪৯]

ঐতিহাসিকভাবে এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারতইতিহাসে কোন শাসকই দমননীতির মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করতে পারেনি। মুঘল সম্রাট আকবর ছিলেন ভারতআত্মার মূল সন্ধানে নিবেদিতপ্রাণ শাসক। জনগণের সকল অংশের প্রতি উদার মানবতাবাদী নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে আকবর ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন ধারার সূচনা করেছেন। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতসন্তান ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বস্তুত আকবর মানুষের মহামিলনের জয়গান গেয়েছেন। দেশের মানুষের মধ্যে বিভক্তি এনে, জোর করে উপর থেকে শাসকের নীতি চাপিয়ে কোনো শাসকই সফলকাম হতে পারেন না। ব্যক্তি আওরঙ্গজেবের মধ্যে বহুবিধ গুণাবলীর সমাবেশ সত্ত্বেও দেশের আপামর মানুষের সাথে বিচ্ছিন্ন সম্পর্কের কারণে তার শাসনামল সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এমনকি মুঘলসাম্রাজ্যের শক্তিশালী ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পতনের দিকে ধাবিত হয়। যদুনাথের ভাষায় :

> The failure of an ideal muslim king like Aurangzib with all the advantages he possessed at his accession and his high moral character and training—is therefore the clearest proof the world can afford of the eternal truth that there can not be a great or lasting empire without a great people, that no people can be great unless it learns to form a compact nation with equal rights and opportunities for all—a nation the component part, of which are homogenous, agreing in all essential points of life and thought but freely tolerating individual difference in minor points and private life, recognising individual liberty as the basis of communal liberty—a nation whose administration in solely bent upon promoting national as opposed to provincial of sectarian interests and a society which pursues knowledge without fear, without cessation, without bounds.[১৫০]

স্পষ্টতই যদুনাথ ব্যক্তিসত্তা, সামাজিকসত্তা এবং রাষ্ট্রসত্তাকে এক ও অভিভাজ্য হিসেবে দেখেছেন। ব্যক্তির মৌলিক তথা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত হওয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি

Scanned with CamScanner

প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় ইতিহাসের বাস্তব প্রেক্ষাপটে বলা যায় এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সামাজিক শান্তির পূর্বশর্ত। ধর্ম ও বর্ণগত বিভেদ মানুষের সম্ভাবনাশক্তিকে রহিত করে দেয়। যদুনাথের মতে শ্রেণীবিভক্ত কিংবা বর্ণভিত্তিক সমাজ বিদেশী শাসনমুক্ত হলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। এতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ষড়যন্ত্র বা পারিবারিক শাসনের সম্ভাবনা থাকে।[১৫১]

ইতিহাস-চিন্তায় ও মননে যদুনাথ সরকার ছিলেন মানবতাবাদী ও সমন্বয়ধর্মী ধারার বাহক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সুপ্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত নরগোষ্ঠী এই ভূখণ্ডে এসে বসতি স্থাপন করেছে এবং কালক্রমে এই ভূখণ্ডের প্রাচীন অধিবাসীদের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে এক অনন্য সমন্বয়ধর্মী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে।[১৫২] মানবসভ্যতার ঐতিহাসিক বিকাশপ্রক্রিয়ার নিয়ম হলো নতুন ও পুরাতনের মাঝে সংঘাত ও সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে নতুন ধারার সৃষ্টি। এই ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—এটা গতিশীল ও সংস্কারমুক্ত। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতির অবদান অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সময়ে ভারতে আগত জাতিসমূহের অবদানকে মূল্যায়ন করে যদুনাথ বলেন :

The Indian people of today are no doubt a composite ethnical product ; but whatever their different constituent elements may have been in origin, they have all acquired a common Indian stamp and have all been contributing to a common culture and building up a common type of tradition thought and literature.[১৫৩]

জাতিসমূহের উৎপত্তি বিভিন্ন হলেও ভারতে আগমনের পর তারা একটি সাধারণ সংস্কৃতি ও সাহিত্যভাবনায় একীভূত হয়েছে। ইতিহাসের কাল পরম্পরায় ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি গ্রহণবর্জনের ভিতর দিয়ে সমন্বয়বাদী ও মানবতাবাদী ধারায় অগ্রসর হয়েছে। যদুনাথের ভাষায় :

> আমাদের ভারতবর্ষ একতার ভূমি। প্রাচীনতম আর্য যুগ থেকে এই সমন্বয় ধারাবাহিকভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে; এবং তার শেষ ফল এখনকার আমরা।[১৫৪]

ইতিহাসবিদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে ইতিহাস গবেষকের সচেতনতা একান্ত প্রয়োজন। কোন ধরনের কল্পনা বা অতীত-বিলাসিতা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য। E H Carr-এর মতে :

> The function of the historian is neither to love the past nor to emencipate himself from the past, but to master and understand it as the key to the understanding of the present.[১৫৫]

মূলত অতীত ও বর্তমানের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি এবং তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ইতিহাসচর্চার প্রকৃত দিক। যদুনাথ সরকারের ইতিহাস-

গবেষণা ও ভাবনা সে লক্ষ্যেই পরিচালিত ছিল। ইতিহাস-সাধনার বিষয়টিকে তিনি নিয়েছেন কঠোর আত্মত্যাগের ও পরিশ্রমের ব্রত হিসেবে। ইতিহাস-গবেষকের কর্তব্য সম্পর্কে যদুনাথ বলেন :

> এ পথে যে পথিক হবে তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজেই কাজ সারবো এই ফন্দি করলে তার শেষ চেষ্টা পণ্ড হবে। যে কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পন্ন করতে বেশি সময় লাগে; তার জন্য অনেকদিন ধরে অনেক রকম উপকরণ যোগাড় করতে হয়।[১৫৬]

সুদীর্ঘ গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন। অতীতের মূল সত্যকে উদ্‌ঘাটনকল্পে নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বিশেষ কোন বিষয়ের প্রতি দুর্বল মনোভাব পোষণ করলে সত্যে উপনীত হওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্য ইতিহাস-গবেষককে কঠোর সত্যের পূজারি এবং অবিচল মনোভাব পোষণ করতে হয়। একজন ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে যদুনাথের অভিমত হলো :

> সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক, আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয় সহিব; কিন্তু তবু সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা।[১৫৭]

এই উক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, যদুনাথ কঠিন সত্যের পূজারি ছিলেন। এমনকি একজন ইতিহাস-গবেষকের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে তিনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, সাহিত্য ও কলার সাধনা ঠিক যোগসাধনার মতো। যোগসাধনে রত তপস্বীর মতই গবেষকদেরকে সরল শ্রমসহিষ্ণু জীবনযাপন করতে হবে, দীর্ঘকাল কঠোর দারিদ্র সহ্য করতে পারলেই তাদের জীবনে সাফল্য বয়ে আসবে।[১৫৮] ভারতীয় ইতিহাস-গবেষণায় নিয়োজিত ইতিহাস-গবেষকদের দায়িত্ব সম্পর্কে যদুনাথ বলেন :

> It is the duty of the historian no to let that past be forgotten ; he must trace these gifts back to their sources give them their due place in the time scheme, and show how they influenced or prepared the succedding ages and what portion of present day Indian life and thought is the distinctive contribution of each race or creed that has lived in this land.[১৫৯]

ভারতভূমিতে আগত বিভিন্ন জাতির অবদান নির্ণয় ও মূল্যায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য ইতিহাসবিদকে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে

Scanned with CamScanner

বিষয়গুলি অনুধাবন করতে হবে। বিভিন্ন গবেষকের মত ও পথের সমন্বয় এবং একই সঙ্গে ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জরুরি প্রয়োজন।

ইতিহাস-গবেষণা, অধ্যয়ন, অনুশীলনে কালবিভাজন একটি আবশ্যকীয় শর্ত। দেশ জাতি বা জনগোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট বিকাশক্রমের সাথে তার কালবিভাজন সম্পর্কিত। প্রত্যেকটি দেশের বা অঞ্চলের ইতিহাসের কতিপয় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। এই জন্য সময়ের পূর্ববিভাগে কৃত্রিম বা সাধারণীকরণ পদ্ধতি ইতিহাসের সত্য উদ্ধারে সহায়ক হয় না। ইতিহাসের ঘটনা খণ্ডিত হওয়ার আশংকায় যদুনাথ কৃত্রিম কালবিভাজন মেনে নিতে পারেন নি। বস্তুত ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশক্রম কিংবা ধারাবাহিকতা কালের নির্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ নয়। যদুনাথের মতে কৃত্রিম কালবিভাজনে অনেক সময় ইতিহাসের ঘটনার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায় না। তাঁর ভাষায় :

> We usually study the history of India as divided into watertight compartments or periods. One great defect of this method of treatment is that we there by loose sight of the life of the nation as a whole, we fail to realize that India has been the home of a living growing people with a continuty remaining through all the ages, each generation using. expanding or modifying what its line of predecessors had left to it.[১৬০]

যদুনাথ শুধুমাত্র ইতিহাসের কালকে নয়, কালের প্রেক্ষিতে ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতেন ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে।

যদুনাথ সরকার আজীবন ইংরেজি ভাষায় ইতিহাসচর্চা করেছেন। বাংলাভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ রচনা করলেও তাঁর ইংরেজি ভাষায় কর্মের তুলনায় সংখ্যা অনেক কম। তবু বাংলাভাষার প্রতি যদুনাথের যত্ন ও মমত্ববোধের অভাব ছিল না। মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ দিয়ে যদুনাথ সরকার বলেন যে, জাতীয় শক্তি বাড়ানোর জন্য মাতৃভাষার সাহিত্যকে পরিপুষ্ট ও বিবিধ জ্ঞানে ভূষিত করে নতুনভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে।[১৬১] বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য যদুনাথ বাংলাভাষাভাষী হিন্দুমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বাঙালি মুসলিম সমাজকে বাংলাভাষা চর্চার জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন :

> মুসলমান ভ্রাতাগণ আপনাদের ধর্ম যাহাই হউক না কেন এখন আপনারা বাঙালি হইয়াছেন। আপনাদের পক্ষে এহেন বাংলাভাষা ত্যাগ করিয়া উর্দু ধরিবার চেষ্টা যেন নিজের সোনার বাড়িতে আগুন ধরাইয়া পরের কুঁড়েঘরের এককোণে অতিথির মত পরদেশীর মত একটু থাকিবার স্থান ভিক্ষা করা।[১৬২]

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে তিনি বরাবরই আগ্রহী ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের ভূমিকা এবং রবীন্দ্রনাথের সাথে সম্পর্ক থেকেও বাংলাভাষার প্রতি যদুনাথের গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইতিহাসদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে একথা বলা যায় যে, সমকালীন ইউরোপের ঐতিহাসিকদের মতো দর্শনভাবনায় তিনি আন্দোলিত হন নি। যদুনাথের ইতিহাস-গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য ছিল আকর উপাদানের ভিত্তিতে ইতিহাসকে পুনর্গঠন করা। আমাদেরকে এটাও মনে রাখতে হবে যে, তখন ইউরোপের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক পিছিয়ে ছিল। ইতিহাসদর্শনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন যে, ইতিহাস ও জীবনকাহিনী একজন মানুষের বাহ্য আকার ও কর্মগুলি আমাদের দেখায়। তার চরিত্র ও জীবনীশক্তির ক্রিয়া বুঝতে হলে এইসব বাহ্য ঘটনার উপর ঐতিহাসিক দর্শন প্রয়োগ করা আবশ্যক।[১৬৩] ইতিহাস-রচনায়, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে ইতিহাসদর্শনের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যদুনাথের অভিমত হলো ইতিহাসের সর্বোচ্চ অঙ্গ হলো ইতিহাসদর্শন। অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনাগুলি থেকে মানবচরিত্র বা জাতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর উপদেশ পাওয়া। এই গুণ থাকলে ইতিহাস সর্বোচ্চ সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন পায়। এটা ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি উপকারিতা।[১৬৪] যদুনাথের ঐতিহাসিক রচনাসমূহ পাঠ করলে ইতিহাসের অবশ্যম্ভাবিতা, উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় প্রভৃতি প্রত্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর ইতিহাস-ভাবনার একটি প্রধান দিক হলো—তিনি নিয়তিবাদে আস্থাশীল ছিলেন। মধ্যযুগে ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহের পশ্চাতে ঈশ্বরের বিধানকে প্রধান শক্তি মনে করা হতো। যদুনাথ মুঘলসম্রাট শাহ আলমের পতনের বিষয়টিকে ইতিহাসের নিয়তি হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন :

> No man can rise above his destiny as the wise of ancient days have truely said—destiny is only another name for character.[১৬৫]

কোনো মানুষই ভাগ্যের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না এই অভিধা বিশ শতকের ইউরোপীয় ইতিহাসতত্ত্বে অনুপস্থিত। যদুনাথের মতে আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার মূলে তার নিয়তি কাজ করেছিল। এই প্রসঙ্গে যদুনাথ বলেন :

> The life of Aurangzib was one long tragedy—a story of man battling in vain aginst on invisible but inexarable fate, a tale of how the strongest human endevour was baffled by the forces of the age.[১৬৬]

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদদৌলার পরাজয়কে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় হিসেবে অভিহিত করে যদুনাথ এই অভিমত ব্যক্ত করেন :

Scanned with CamScanner

In June 1757 we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal.[১৬৭]

পলাশীর যুদ্ধের এই বিশাল পরিবর্তনের দিকটি যদুনাথের কাছে মনে হয়েছে ভাগ্যের খেলা। নাদির শাহের ভারত-আক্রমণের পর প্রাকৃতিক জলবায়ুর অনুকূলতাকে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হিসেবে বর্ণনা করে যদুনাথের অভিমত হলো :

> Heaven seemed to have taken pits on the sorely afflicted people on Northern India. In the next season these was adequate and timely rainfall, the earth yielded a profuse harvest and all foot stuffs became cheap and plentiful, as it to make amends for the peoples recent sufferings.[১৬৮]

সীমাবদ্ধতা

যদুনাথ সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে ও ইতিহাস-ভাবনায় সামান্য সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। একজন ঐতিহাসিক একটি যুগের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করেন। এই যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রবাহে ইতিহাসবিদের মানসলোক গড়ে উঠে। যদুনাথের সময়কালে বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে তিনটি মৌলিক বিষয় লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। যদুনাথের জন্ম, শিক্ষা, কর্মজীবন অতিবাহিত হয় এই কাঠামোর মধ্যে। দ্বিতীয়ত, এই সময়কালটি এদেশের ইতিহাসে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়কাল। তৃতীয়ত, বিশ শতকের প্রথমার্ধ বাংলা ও ভারতের রাজনীতিতে ক্রমাগত হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিরোধ ও উত্তেজনায় ভরপুর। একথা বলাই বাহুল্য যে, ইংরেজ শাসনের আর্থ-সামাজিক পরিবেশে বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিক মনীষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ। মধ্যযুগীয় সামাজিক অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা ও সম্পর্ক, আধুনিক জীবনাদর্শ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন, আইন প্রভৃতি ইংরেজশক্তি ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। ইংরেজরা ভারতকে আধুনিক বিশ্বসভ্যতার সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। যদুনাথ সরকার ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি ছিলেন সবিশেষ দুর্বল। ব্রিটিশশাসনের ফলাফল সম্পর্কে তিনি বলেন :

> The greatest gift of the English, after universal peace and the modernisation of society and indeed the direct results of these two forces—is the Renaissance which marked our 19th century. Modern India owes everything to it. This renaissance was at an intellectual awakening and influenced our literature, education, thought and art; but in the next generation it become a moral force and reformed our society

> and religion. Still later in the third generation from its commencement, it has led to begining of the economic modernization of India.[১৬৯]

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদুনাথ ব্রিটিশশাসনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ফলাফল অত্যন্ত উচ্ছ্বসিতভাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতে ব্রিটিশশাসনের রাজনৈতিক ফলাফল প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত হলো এই যে, ব্রিটিশশক্তি জাতিগত সংঘাত, রাজ্যে রাজ্যে সংঘর্ষ, রাজনৈতিক অরাজোকতার পরিবর্তে সমগ্র ভারতে একক রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং একই সঙ্গে বিদেশী আক্রমণের সম্ভাবনাকে অসম্ভব করে দিয়েছে।[১৭০] ব্রিটিশশক্তি কর্তৃক বাংলা ও ভারতে আধুনিকতার সূচনা ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসের ইতিবাচক দিক। একই সঙ্গে তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ, দমন, পীড়ন, রাজনৈতিক অধিকার হরণ এবং ঔপনিবেশিক পরাধীনতা এদেশের মানুষের জন্য মোটেই সুখকর ছিল না। আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশশক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটানা কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সমকালীন ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দিক। যদুনাথ সরকারের লেখনীতে ইতিহাসের এই দিকটি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বস্তুত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ লালিত বলে ইংরেজদের প্রতি দুর্বলতা সহজাত। তাদের মানসলোক গঠিত হয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার এবং ব্রিটিশ বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীর কাঠামোর মাঝে। তৎকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচার করলে ব্রিটিশশাসনের প্রতি এই দুর্বলতার জন্য যদুনাথকে দায়ী করা যায় না। কেননা তিনি ভারতীয় ইতিহাসের সুদীর্ঘ পটভূমিতে বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশশাসনকে দেখেছেন, মূল্যায়ন করেছেন, কোন ক্ষুদ্র বা সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নয়। যদুনাথের ইতিহাস-ভাবনার অন্য একটি দুর্বল দিক হলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রশ্নে প্রায় নীরবতা। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে নিয়তিবাদী ব্যাখ্যা যদুনাথের ইতিহাস-ভাবনার একটি মৌলিক দুর্বলতা। তাঁর সামরিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার তুলনায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার পরিমাণ অনেক কম।

সামগ্রিক মূল্যায়ন

বাঙালির ইতিহাস-সাধনায় যদুনাথ সরকারের স্থান কোথায়? উনিশ শতক তাঁর যৌবন এবং বিশ শতকে কর্মজীবন ও ইতিহাস-গবেষণার সময়কাল। বাংলা ও ভারতের ইতিহাসে যদুনাথের সময়কালটি অত্যন্ত ঘটনাবহুল। যোগেশচন্দ্র বাগলের মতে যদুনাথ দুই শতাব্দীর সেতুবন্ধন হয়ে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[১৭১] ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক শাসন কাঠামো এবং ভারতের আন্তঃসম্পর্কের মাঝে তিনি ভালমন্দ উভয় দিক প্রত্যক্ষ করেছেন। উগ্র ও

Scanned with CamScanner

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে যদুনাথ কখনোই সমর্থন করেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থেই মডারেট বা মধ্যপন্থী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দ্বারা (১৯০৫) আন্দোলিত হলেও তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েননি। অবশ্য যদুনাথের লেখনীমালা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করেছিল।[১৭২] তাঁর ইতিহাস-রচনায় ও ভাবনায় দক্ষতার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আঠারো শতকের ভারতের নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলার মধ্যেও যে রাষ্ট্রীয় সংহতির একটি মূলসূত্র আছে এবং তা অবলম্বন করে যে সমগ্র দেশের প্রামাণ্য রাজনৈতিক ইতিহাস-রচনা করা সম্ভব যদুনাথ প্রথম এটা প্রমাণ করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপরও যদুনাথের লেখা আলোকপাত করেছে। ছয় দশককাল মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস-গবেষণায় নিয়োজিত থেকে যদুনাথ নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে A. L. Srivastava বলেন :

> It is likely to continue to exert itself for a long time to come, for sir Jadunath became, perhaps unintentionally, the father of a new school of medieval Indian historiography in real sense. This school is functioning without the master.[১৭৩]

যদুনাথ প্রতিষ্ঠিত এই ধারার মূল দিকসমূহ হলো—মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কিত সকল ভাষায় দক্ষতা অর্জন, এই ভাষাসমূহের মাধ্যমে মূল উৎসের অনুসন্ধান, উপাত্তসমূহের পরীক্ষানিরীক্ষা এবং মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, যদুনাথ সরকারকে কেবল র‍্যাঙ্কে, নিবুর এবং মমসেন প্রমুখদের সাথে তুলনা করা যায়। তিনি আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা।[১৭৪] যদুনাথ সরকারের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে একজন গবেষক বলেন :

> In our age, he is rightly known as one of the pioneers of writing history in a scientfic manner. Sarkar can be credited of giving right direction to the work of historical research in India. We can rightly place him in the category of great historians, not only of India, but of the world.[১৭৫]

অর্থাৎ আমাদের যুগে তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চায় অগ্রণীদের অন্যতম। ভারতে ইতিহাস-গবেষণার তিনি পথিকৃৎ। আমরা তাকে শুধু ভারতের নয়, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিকদের একজন বলতে পারি। ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব ১৯২২ সালে যদুনাথকে Bengali Gibbon এবং মারাঠা ঐতিহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই তাঁকে Gibbon of India হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৭৬]

ইতিহাস অনুসন্ধানে, গবেষণায়, চিন্তায়, মননে, ভাবনায়, চর্চায় এবং অনুশীলনে যদুনাথ সরকার নতুন ধারার প্রবর্তক। বাঙালির উনিশ শতকের ইতিহাস-ভাবনার জগৎকে তিনি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে বিশ

শতকের ইতিহাস-গবেষণায় নতুন পথের সন্ধান দেন। যদুনাথ কেবলমাত্র ইতিহাসের বর্ণনাকারী নন, একই সঙ্গে ইতিহাসের সত্যসন্ধানী ব্যাখ্যাকার। বিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসচর্চা এবং গবেষণায় তিনি পথনির্মাতা ও পথনির্দেশক। সমকালীন বাংলা এবং ভারতের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রেক্ষিত ভাবনায় যদুনাথ জাতীয়তাবাদী। মানুষের মূল্যায়নে তিনি উদার ও মানবতাবাদী। ইতিহাসের ব্যক্তি কিংবা ঘটনাপ্রবাহের মূল সত্য উদ্‌ঘাটনকল্পে তিনি মৌলিক তথ্যের অনুসন্ধানী। প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য ছাড়া কোন বিষয় যদুনাথের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ভাবনায় তিনি ছিলেন সমন্বয়বাদী। ভারত ভূমিতে আগত বিচিত্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই ভারতসংস্কৃতি গঠনে অবদান রেখেছে। বিচিত্র সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ভিতর দিয়ে আজকের ভারতসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। যদুনাথের মননে ও চেতনায় ইতিহাস সামগ্রিক মানবসত্তার, মানবসমাজের। শুধু শাসকের ইতিহাস কোন দেশ বা সমাজের ইতিহাস নয়। ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন সুদূর অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান এক বিকাশপ্রক্রিয়া—যা মানুষের সম্মিলিত কর্মপ্রবাহের ভিতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছে। ঐতিহাসিক ঘটনার নিকট পর্যবেক্ষণ এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণ যদুনাথের ইতিহাস-ভাবনার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। সামগ্রিক বিচারে যদুনাথ সরকার বাঙালির আধুনিক ইতিহাসতত্ত্বের জনক এবং বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ঐতিহাসিক।

তথ্যনির্দেশ

১. John Lukaes, *Historical Consciousness* (New York 1968), P. 22

২. P. Kejariwai, *The Asiatic Society of Bengal and the Discovery of India's Past 1784-1853*. (Delhi 1988), p.28

৩. R. C. Majumdar, *Historiography in Modern India* (London 1970), P. 27

৪. বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'আচার্য যদুনাথ স্মরণে' উদ্ধৃত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় কৃত 'আচার্য যদুনাথ সরকার' ইতিহাস (কলকাতা), নবপর্যায়, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৭

৫. G. R. Elton, *The Practice of History* (London, 1967), p. 32

৬. নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, 'ভূমিকা' স্যার যদুনাথ রচনাপঞ্জি, সঙ্কলক : অমলেন্দু দে, বিনয় ভূষণ রায় (কলকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ক

৭. নীহাররঞ্জন রায়, মণি বাগচী লিখিত আচার্য যদুনাথ জীবন ও সাধনা গ্রন্থের ভূমিকা (কলকাতা, ১৯৭৫), পৃ. ৯

৮. বিভা সরকার, 'স্যার যদুনাথের পূর্ব পুরুষগণ ও আদি নিবাস', ইতিহাস (কলকাতা), নবপর্যায়, ৫ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৌষ-চৈত্র ১৩৭৭, পৃ. ২০৫

Scanned with CamScanner